KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৭/- ৭/- ৭/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ পৌষ, ১৩৫৫ ফাল্গুন, ১৩৫৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৩৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

"রাশেস" নক্সায়

ডালি

নতুন ডালি-গঠনের বৈশিষ্ট্য হ'ল তার পাটির নক্সা কাটা ধার ও গা বেয়ে নেমে আসা সোনালী রেখার ধারা। 'ডালি' গঠনের উপর হাল্কা ধূসর আর ফিকে বেগুনি রং-এর এই নক্সা সত্যিই মনোরম। অল্প দাম, ভেঙ্গে গেলে জুড়ি পাওয়া যায়। বেঙ্গল পটারিজ-এর চমৎকার চীনা মাটির বাসনগোষ্ঠীর মধ্যে এই নতুন ডিজাইনের 'টি' 'ডিনার' ও 'কফি' সেট পাওয়া যায়।

১০৮৩ নং সেট

বেঙ্গল পটারিজ লিমিটেড

একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি :

অ্যালায়েড ডিষ্টিবিউটর্স অ্যাণ্ড কোং ৩৩, ব্রেবোর্ণ রোড, কলিকাতা ১

BPC-26 BEN

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

সমকালীন

অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

জন ষ্টুয়ার্ট মিল। মঞ্জুলা বসু ৪৮৫

রেখা, রূপ ও দর্শন। মুরারি ঘোষ ৪৯২

গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই বসু ৫০০

সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৫০৭

চ্যালেঞ্জ। রাখাল ভট্টাচার্য ৫১২

বাক্যপতংগ ও নিঃসংগ পাঠক। পবিত্র পাল ৫১৮

বাংলাসাহিত্যে স্বাধীনতার প্রভাব। পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫১৫

ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনী। বিনায়ক সেন ৫২৩

সমালোচনা— সোমেন বসু। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫২৫

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

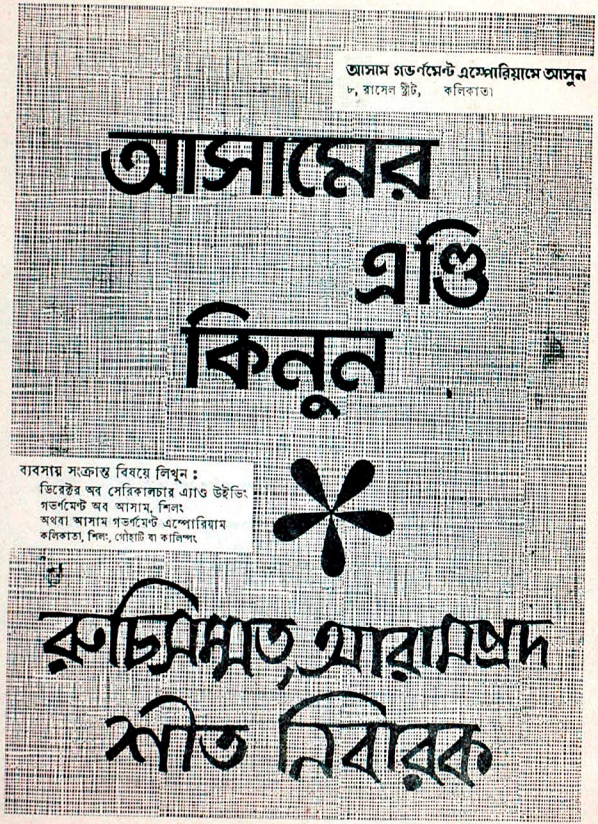

সপ্তম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা

সমকালীন

অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

জন ষ্টুয়ার্ট মিল

মঞ্জুলা বসু

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল। ক্ল্যাসিকাল চিন্তাধারার শেষ প্রতিভূও তিনিই। যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন স্মিথ এবং রিকার্ডো, তাকেই চরম উৎকর্ষে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন মিল। ১৮০৬ সালে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু ১৮৭৩ সালে। অর্থবিদ্যার জগতে তাঁর কালে যে প্রতিষ্ঠা মিল পেয়েছিলেন তা পাবার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে। এমন কি অ্যাডাম স্মিথেরও হয়নি। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে গেছেন মিল। দ্বিতীয়তঃ তিনিই একমাত্র ক্ল্যাসিকাল লেখক যাঁর মনে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনও সংশয় উপস্থিত হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে তিনি জেনেছেন তার অপূর্ণতা। তাঁর যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক মন তীক্ষ্ণভাবে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিচার করেছে, ফলে সেই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি নগ্ন হয়ে ধরা পড়েছে লোকের চোখে।

যেমন বিস্ময়কর মিলের দ্রুত অভ্যুত্থান তেমনি বিস্ময়কর তাঁর প্রভাবের দ্রুত অবলুপ্তি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই অর্থনীতিবিদ হিসাবে তার কথা লোকে মনে রাখলো না। মিলের পরিচয় হোলো "অন লিবার্টি" "রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্ণমেণ্ট" "সাবজেকশান অব উইমেন" ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িতা এবং স্বাধীনতার সমর্থক রূপে, কিন্তু অর্থনীতিবিদরূপে নয়। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—সূক্ষ্ম তত্ত্বগত আলোচনার বৈদগ্ধ্যে মিলের তুলনা নেই, ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিতে যতগুলি নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে সবগুলির একটি আপাতসার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন মিল—এই সবই যেমন সত্য তেমনি সত্য এই কথাটিও যে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন ধারণারই সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি মিল। সেদিক থেকে স্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস এঁদের স্থান অনেক উপরে। তাঁর তিরোধানের অনতিকাল পরেই ক্ল্যাসিকাল চিন্তাধারায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। একদিকে এসেছে মার্কসবাদের আক্রমণ, অন্যদিকে মার্জিনাল স্কুলের। সেই ভাঙনের পথও দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারেন নি মিল।

এই সার্থকতা এবং ব্যর্থতা উভয়েরই কারণ হোলো এই যে মিল চিন্তার জগতে বিশেষ

একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকে নূতনের আহ্বান তিনি পেয়েছেন, পুরাতন ব্যবস্থার গলদও তাঁর চোখে পড়েছে, কিন্তু পুরাতন সংস্কারকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার কারণ, বিশ্লেষণী মন ছিল তাঁর, কিন্তু দূরদৃষ্টি ছিল না। বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়, অবিচারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, মিলের সংবেদনশীল মন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তবু ক্ল্যাসিকাল চিন্তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে নতুন পথ তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

প্রচলিত পরিবেশকে যে মিল সার্থকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তার কারণ তাঁর জন্মগত পারিবারিক আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা। মিলের জীবনকে প্রগাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন একটি লোক—তিনি তাঁর পিতা জেমস মিল। জেমস মিল ধনী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়া হাউসের সামান্য একজন কেরাণী। কেরাণীগিরি ও পরে লেখার অনিশ্চিত আয় থেকে তিনি আটটি সন্তানকে মানুষ করেছেন। কিন্তু চিন্তাশক্তির দৈন্য তাঁর ছিল না। জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা হওয়া ছাড়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই তিনি বেনথাম, রিকার্ডো, গ্রোট প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল লেখকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন করে নিয়েছেন। বেনথাম ও রিকার্ডোর তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইউটিলিটারিয়ান দর্শনের জন্মদাতা হিসাবে বেনথামের সঙ্গে তাঁর নামও স্মরণীয়। এ ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে "প্রিন্সিপল্‌স অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি" ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি ভলুম রচনা। দুটিই তিনি লিখেছেন অন্য যে কোনও লেখকের চেয়ে কম সময়ে এবং প্রচণ্ড সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে। জন স্টুয়ার্টের শৈশব ও কৈশোরকে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে পরিচালিত করেছিলেন। খুব কম পিতাই পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার জন্য এমন সক্রিয়ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে থাকেন, এবং অন্য কোনও ক্ষেত্রে এই এক্সপেরিমেন্ট সফল হোতো কিনা সন্দেহ। সর্বাধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যে কোনও লোকই মিলের বাল্যশিক্ষার কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর আত্মজীবনীতে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। কবে তিনি প্রথম গ্রীক শিখতে আরম্ভ করেছেন মনেই পড়ে না কারণ তিন বছর বয়সে মিলের গ্রীক শিক্ষার হাতে খড়ি। আট বছরের মধ্যেই সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রীক লেখকদের লেখা শেষ করে ধরলেন ল্যাটিন। ল্যাটিন শেখা চললো বারো বছর পর্যন্ত। গ্রীক ল্যাটিনের সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ইতিহাস চর্চ্চা চলছিল। এগুই ফাঁকে মিল স্বাধীনভাবে কিছু ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একটি বাধ্যতামূলক কাজ ছিল ইংরেজীতে কাব্যরচনা ও পিতাকে তা পড়ে শোনানো। উপরন্তু একটি অপ্রিয় কাজ জন স্টুয়ার্টকে করতে হোতো। ম্যালথাসের উপদেশে জেমস মিল নিশ্চয়ই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছোট ভাইবোনদের পড়ানোর দায়িত্ব ছিল জ্যেষ্ঠ জন স্টুয়ার্টের উপর। পাছে স্বভাবে আলস্য এসে পড়ে তাই ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না। কোন বাল্যবন্ধুর সঙ্গ বা খেলাধূলার আনন্দ থেকে মিল বঞ্চিত ছিলেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে তাও জানবার মত ফাঁক তাঁর জীবনে ছিলনা। এই অদ্ভুত পরিবেশেও তিনি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন শুধু তাঁর অসাধারণ মনীষার বলে।

বারো বছরের মধ্যেই মিলের অর্থশাস্ত্রে হাতেখড়ি। রোজ তিনি পিতার সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন। তখন স্মিথ রিকার্ডোর মূলতত্ত্বগুলি নিয়ে পিতাপুত্রে আলোচনা চলতো। জন স্টুয়ার্ট এঁদের লেখা পড়তেন ও পিতাকে সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতেন। জেমস মিল এর প্রিন্সিপল্‌স এর খসড়া এইভাবেই তৈরী হয়। তেরো বছরের মধ্যে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যা জান-

বার সবই মিলের জানা হয়ে গেল। পিতার মাধ্যমে তিনি একটি অভাবনীয় সুযোগ পেয়েছিলেন, তা হোলো রিকার্ডো, বেনথাম, হিউম এঁদের সঙ্গে আলোচনার। তখন থেকেই বেনথামের ইউটিলিটারিয়ানিজম ও সর্বোচ্চ সংখ্যার সর্বাধিক সুখ এই দুটি আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। জেরেমী বেনথামের ভ্রাতা স্যার স্যামুয়েল বেনথামের সাহচর্যে তিনি ফ্রান্সে বেড়াবার সুযোগ পেলেন। সেখানে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিল পিতার সহায়তায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে পিতারই অধীনস্থ কর্মচারী হয়ে ঢুকলেন। তাঁর কাজ ছিল কোম্পানীর চিঠিপত্র তৈরী করা। পরে তিনি "এগজামিনার অব করেসপণ্ডেন্স" পদে উন্নীত হন ও মহারাণীর সনদের ফলে কোম্পানীর বিলুপ্তি পর্যন্ত সেই পদেই বহাল ছিলেন। এই কাজে পড়াশুনোর সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল।

মিলের প্রথম প্রকাশিত লেখা ১৮২২ সালে ট্র্যাভেলার কাগজে ছাপা দুটি চিঠি। জেমস মিল ও বেনথাম "ওয়েস্ট মিনিস্টার রিভিউ" নামে একটি প্রগতিধর্মী কাগজ বের করতেন। তাতে নিয়মিত লেখক ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। লিবারেলিজমের ধারণার অনেকটা সূচনা করেছে এই কাগজটি। এই সময় লণ্ডন ও এডিনবরার বিভিন্ন বিতর্কসভায় মিল যোগ দেন ও জনসমক্ষে বক্তৃতা করনে। তবে ভালো বক্তা তিনি কোনওদিনই ছিলেন না।

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা অনেক হোলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন মিল আবিষ্কার করলেন এতে মন ভরে না। বিংশোত্তীর্ণ যে বয়সে লোকে আবেগপ্রবণতা ছেড়ে বুদ্ধির চর্চায় মন দেয় সেই বয়সে মিল প্রথম জানলেন যে শুষ্ক জ্ঞান আহরণ ছাড়া জীবনে আবেগেরও স্থান আছে। হৃদয়ের শূন্যতাকে ভরাবার জন্য তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন গ্যেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সেণ্ট সাইমনের লেখা। এই সময় তাঁর জীবনে এলেন মিসেস হ্যারিয়েট টেলর। মিলের বয়স তখন পঁচিশ আর টেলরের তেইশ। এই পরিচয় শিগগিরই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হোলো। হ্যারিয়েটের সম্বন্ধে মিল বলেছেন—সুন্দরী মার্জিতরুচি ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর চরিত্র, বুদ্ধি, নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদির প্রসঙ্গে মিল তাঁকে বলেছেন—"the most admirable person I had ever knownof". পিতার শিক্ষায় মিলের যা অভাব ছিল তার পূরণ করলেন হ্যারিয়েট টেলর। মিলের হৃদয়াবেগের পথকে উন্মুক্ত করলেন হ্যারিয়েট, স্ত্রী জাতির অধিকার ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুললেন। জেমস মিল ও মিসেস.টেলর এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব সম্বন্ধে মিল বলেছেন—

"Who either now or hereafter, may think of me and of the work I have done, must never forget that it is the product, not of one intellect and conscience, but of three".

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, মিস্টার টেলর নামক ভদ্রলোকটি তখনও জীবিত, তবে তিনি আগাগোড়া নেপথ্যেই থেকেছেন। কুড়ি বছর ধরে জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেলর পরস্পরকে ভালোবেসেছেন, একসঙ্গে বেড়িয়েছেন এবং থেকেছেন। কিন্তু সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, মিস্টার ও মিসেস টেলরের দাম্পত্য সম্পর্কও অটুট ছিল। মিসেস টেলর স্বামীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি এবং মিল। যাই হোক তাঁর মৃত্যুর পরে মিলের সঙ্গে হ্যারিয়েটের বিয়ে হয়।

তাঁর আত্মজীবনীর প্রতি ছত্রে মিল হ্যারিয়েটের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "All my published works were as much her work as mine". "The benefit

একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকে নূতনের আহ্বান তিনি পেয়েছেন, পুরাতন ব্যবস্থার গলদও তাঁর চোখে পড়েছে, কিন্তু পুরাতন সংস্কারকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার কারণ, বিশ্লেষণী মন ছিল তাঁর, কিন্তু দূরদৃষ্টি ছিল না। বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়, অবিচারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, মিলের সংবেদনশীল মন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তবু ক্ল্যাসিকাল চিন্তার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে নতুন পথ তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি।

প্রচলিত পরিবেশকে যে মিল সার্থকভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তার কারণ তাঁর জন্মগত পারিবারিক আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা। মিলের জীবনকে প্রগাঢ়ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন একটি লোক—তিনি তাঁর পিতা জেমস মিল। জেমস মিল ধনী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়া হাউসের সামান্য একজন কেরাণী। কেরাণীগিরি ও পরে লেখার অনিশ্চিত আয় থেকে তিনি আটটি সন্তানকে মানুষ করেছেন। কিন্তু চিন্তশক্তির দৈন্য তাঁর ছিল না। জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা হওয়া ছাড়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই তিনি বেনথাম, রিকার্ডো, গ্রোট প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল লেখকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আসন করে নিয়েছেন। বেনথাম ও রিকার্ডোর তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইউটিলিটারিয়ান দর্শনের জন্মদাতা হিসাবে বেনথামের সঙ্গে তাঁর নামও স্মরণীয়। এ ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে "প্রিন্সিপল্‌স অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি" ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি ভল্যুম রচনা। দুটিই তিনি লিখেছেন অন্য যে কোনও লেখকের চেয়ে কম সময়ে এবং প্রচণ্ড সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে। জন স্টুয়ার্টের শৈশব ও কৈশোরকে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে পরিচালিত করেছিলেন। খুব কম পিতাই পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার জন্য এমন সক্রিয়ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে থাকেন, এবং অন্য কোনও ক্ষেত্রে এই এক্সপেরিমেন্ট সফল হোতো কিনা সন্দেহ। সর্বাধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল যে কোনও লোকই মিলের বাল্যশিক্ষার কথা শুনলে আঁতকে উঠবেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর আত্মজীবনীতে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। কবে তিনি প্রথম গ্রীক শিখতে আরম্ভ করেছেন মনেই পড়ে না কারণ তিন বছর বয়সে মিলের গ্রীক শিক্ষার হাতে খড়ি। আট বছরের মধ্যেই সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রীক লেখকদের লেখা শেষ করে ধরলেন ল্যাটিন। ল্যাটিন শেখা চললো বারো বছর পর্যন্ত। গ্রীক ল্যাটিনের সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ইতিহাস চর্চা চলছিল। এরই ফাঁকে মিল স্বাধীনভাবে কিছু ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একটি বাধ্যতামূলক কাজ ছিল ইংরেজীতে কাব্যরচনা ও পিতাকে তা পড়ে শোনানো। উপরন্তু একটি অপ্রিয় কাজ জন স্টুয়ার্টকে করতে হোতো। মাালথাসের উপদেশে জেমস মিল নিশ্চয়ই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর পুত্রকন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছোট ভাইবোনদের পড়ানোর দায়িত্ব ছিল জ্যেষ্ঠ জন স্টুয়ার্টের উপর। পাছে স্বভাবে আলস্য এসে পড়ে তাই ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না। কোন বাল্যবন্ধুর সঙ্গ বা খেলাধূলোর আনন্দ থেকে মিল বঞ্চিত ছিলেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে তাও জানবার মত ফাঁক তাঁর জীবনে ছিলনা। এই অদ্ভুত পরিবেশেও তিনি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন শুধু তাঁর অসাধারণ মনীষার বলে।

বারো বছরের মধ্যেই মিলের অর্থশাস্ত্রে হাতেখড়ি। রোজ তিনি পিতার সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন। তখন স্মিথ রিকার্ডোর মূলতত্ত্বগুলি নিয়ে পিতাপুত্রে আলোচনা চলতো। জন স্টুয়ার্ট এঁদের লেখা পড়তেন ও পিতাকে সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতেন। জেমস মিল এর প্রিন্সিপল্‌স এর খসড়া এইভাবেই তৈরী হয়। তেরো বছরের মধ্যে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যা জান-

বার সবই মিলের জানা হয়ে গেল। পিতার মাধ্যমে তিনি একটি অভাবনীয় সুযোগ পেয়েছিলেন, তা হোলো রিকার্ডো, বেনথাম, হিউম এঁদের সঙ্গে আলোচনার। তখন থেকেই বেনথামের ইউটিলিটারিয়ানিজম ও সর্বোচ্চ সংখ্যার সর্বাধিক সুখ এই দুটি আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। জেরেমী বেনথামের ভ্রাতা সার স্যামুয়েল বেনথামের সাহচর্যে তিনি ফ্রান্সে বেড়াবার সুযোগ পেলেন। সেখানে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিল পিতার সহায়তায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে পিতারই অধীনস্থ কর্মচারী হয়ে ঢুকলেন। তাঁর কাজ ছিল কোম্পানীর চিঠিপত্র তৈরী করা। পরে তিনি "এগজামিনার অব করেসপণ্ডেন্স" পদে উন্নীত হন ও মহারাণীর সনদের ফলে কোম্পানীর বিলুপ্তি পর্যন্ত সেই পদেই বহাল ছিলেন। এই কাজে পড়াশুনোর সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল।

মিলের প্রথম প্রকাশিত লেখা ১৮২২ সালে ট্র্যাভেলার কাগজে ছাপা দুটি চিঠি। জেমস মিল ও বেনথাম "ওয়েস্ট মিনিস্টার রিভিউ" নামে একটি প্রগতিধর্মী কাগজ বের করতেন। তাতে নিয়মিত লেখক ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। লিবারেলিজমের ধারণার অনেকটা সূচনা করেছে এই কাগজটি। এই সময় লণ্ডন ও এডিনবরার বিভিন্ন বিতর্কসভায় মিল যোগ দেন ও জনসমক্ষে বক্তৃতা করনে। তবে ভালো বক্তা তিনি কোনওদিনই ছিলেন না।

বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা অনেক হোলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন মিল আবিষ্কার করলেন এতে মন ভরে নি। বিংশোত্তীর্ণ যে বয়সে লোকে আবেগপ্রবণতা ছেড়ে বুদ্ধির চর্চায় মন দেয় সেই বয়সে মিল প্রথম জানলেন যে শুষ্ক জ্ঞান আহরণ ছাড়া জীবনে আবেগেরও স্থান আছে। হৃদয়ের শূন্যতাকে ভরাবার জন্য তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন গোটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সেণ্ট সাইমনের লেখা। এই সময় তাঁর জীবনে এলেন মিসেস হ্যারিয়েট টেলর। মিলের বয়স তখন পঁচিশ আর টেলরের তেইশ। এই পরিচয় শিগগিরই গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হোলো। হ্যারিয়েটের সম্বন্ধে মিল বলেছেন—সুন্দরী মার্জিতরুচি ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর চরিত্র, বুদ্ধি, নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদির প্রসঙ্গে মিল তাঁকে বলেছেন—"the most admirable person I had ever knownof". পিতার শিক্ষায় মিলের যা অভাব ছিল তার পূরণ করলেন হ্যারিয়েট টেলর। মিলের হৃদয়াবেগের পথকে উন্মুক্ত করলেন হ্যারিয়েট, স্ত্রী জাতির অধিকার ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুললেন। জেমস মিল ও মিসেস টেলর এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রভাব সম্বন্ধে মিল বলেছেন—

"Who either now or hereafter, may think of me and of the work I have done, must never forget that it is the product, not of one intellect and conscience, but of three".

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, মিস্টার টেলর নামক ভদ্রলোকটি তখনও জীবিত, তবে তিনি আগাগোড়া নেপথ্যেই থেকেছেন। কুড়ি বছর ধরে জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেলর পরস্পরকে ভালোবেসেছেন, একসঙ্গে বেড়িয়েছেন এবং থেকেছেন। কিন্তু সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, মিস্টার ও মিসেস টেলরের দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট ছিল। মিসেস টেলর স্বামীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি এবং মিল। যাই হোক তাঁর মৃত্যুর পরে মিলের সঙ্গে হ্যারিয়েটের বিয়ে হয়।

তাঁর আত্মজীবনীর প্রতি ছত্রে মিল হ্যারিয়েটের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "All my published works were as much her work as mine". "The benefit

I received was far greater than any I could hope to give". "The most valuable ideas and features in these joint productions—those which have been most fruitful of important results and have contributed to the success and reputation of the works themselves—originated with her". "What was abstract and purely scientific was generally mine; the properly human eliment came from her: in all that concerned the application of philosophy to the exigencies of human society and progress, I was her pupil, alike in boldness of speculation and cauatiousness of practical judgment".

মিলের ব্যক্তিগত জীবনের এই দুই বিপরীতমুখী প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর অর্থনীতিতে। জেমস মিলের পুত্র ও বেনথামের শিষ্য জন স্টুয়ার্ট মিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর জীবনের আদর্শ আর সমাজদর্শন হোলো বেনথামের ইউটিলিট্যারিয়ানিজম যা তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছে যে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাই সমাজের সব উন্নতির মূলে। সেই গভীর আস্থা একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে চার্টিস্টদের, সোস্যালিস্টদের ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের থেকে। অন্যদিকে মানবিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুলেছেন হ্যারিয়েট টেলর। পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্বন্ধে মিল ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। জীবনের শেষদিকে ক্রমশঃই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে সংশয় তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। সোস্যালিজমের পূর্বাভাস তাই দেখতে পাই মিলের মধ্যে। এই পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন

"While we repudiated with the greatest energy that tyranny of society over the individual which most socialistic systems are supposed to involve, we yet looked forward to a time when society will no longer be divided into the idle and the industrious; when the rule that they who do not work shall not eat, will be applied not to paupers only, but impartially to all; when the division of the produce of labour, instead of depending, as in so great a degree it now does, on the accident of birth, will be make by concert on an acknowledged principle of justice".

নবজাত শ্রমিক আন্দোলনের উপর তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রতিভূ হয়েও তিনি সব সময় প্রগতিশীল দলের সমর্থনে বলেছেন—যেমন আয়র্ল্যাণ্ডের ভূমিব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী ও মহিলাদের ভোটাধিকার ইত্যাদি প্রসঙ্গে। তাঁর "Principles of Political Economy" র এক জায়গায় মিল বলছেন

"It is not to be expected that the division of the human race into two hereditary classes, employers and employed, can be permanently maintained, কম্যুনিজম সম্বন্ধে দ্বিধাবিমুক্ত চিত্তে তিনি ঘোষণা করেছেন যে— "(If) The choice were to be made between Communism with all its chances and the present state of society with all its sufferings and injustice, if the institution of private property necessarily carried with it as a consequence, that the produce of labour should be apportioned as we now see it, almost in an inverse ratio to the labour,.....if this or Communism were the alternative, all the difficulties, great or small, of communism would be but as dust in the balance".

স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে, এতটাই যদি মিল এগিয়েছিলেন তবে তিনি সোস্যালিজমের পথপ্রদ্রষ্টা বলে কেন স্মরণীয় হয়ে রইলেন না। তার কারণ মিল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। সে পথের অন্তরায় ছিল তাঁর পূর্বার্জিত শিক্ষা ও সংস্কার। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এদের উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট না থাকলেও শেষ অবধি টিকে ছিল। তাই তিনি যা চেয়েছিলেন তা কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়—সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাঝামাঝি একটা আপোষ। ফরাসীবিপ্লবের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করে কার্ল মার্কস এর যুগে বাস করে এবং সেণ্ট সাইমনের বন্ধু হয়েও মিল বুঝতে পারেন নি যে সমাজব্যবস্থা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদের ততটুকুই তিনি মেনে নিতে রাজী ছিলেন আর ক্যাপিট্যালিজমের ততটাই ছাড়তে রাজী ছিলেন পুঁজিবাদী কাঠামোকে বজায় রেখে তার গলদগুলি সংশোধনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। তাঁর মতে মূল সমাজ সমস্যা হোলো, "How to unite the greatest individual liberty of action with a common ownership of the raw material of the globe, and an equal participation of all in the benefits of combined labour". তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শবাদের মধ্যে সমন্বয় সার্থক হতে পারে না। তাই মিল না পেরেছেন ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে, না পারলেন সোস্যালিজমের অগ্রদূত রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। তাঁর প্রিন্সিপলস এর মর্যাদাও এ্যাডম-স্মিথের ওয়েলথ অব নেশনস বা রিকার্ডোর প্রিন্সিপলস এর সমপর্যায়ের নয়।

তবু মিলের অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ তাঁর যুগে তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বলে গণ্য হতেন। দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিক থেকে অর্থশাস্ত্র মিলের সময় চরম উন্নতি লাভ করেছে। আবার এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির গলদগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। তৃতীয়তঃ কোন মৌলিক থিওরীর সৃষ্টি না করে গেলেও মিল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সেদিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী লেখকদের কল্পিত অমোঘ অদৃশ্য শক্তির প্রভাব থেকে মিল অর্থশাস্ত্রকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টি বলেই তার পরিবর্তন সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। এইভাবে মানবিকতার আবেদনকে তিনি ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে প্রথম স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্যক্তিনিরপেক্ষ কতগুলি অপরিবর্তনীয় বিধির কথা চিন্তা না করে মিল দেখাতে চেয়েছেন সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনা দরকার। তাঁর বইয়ের নাম তাই তিনি রেখেছেন "Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy".

মিলের অর্থনৈতিক চিন্তায় মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা। এইখানেই মিল বিশেষ করে ক্ল্যাসিকাল প্রভাবকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতির সঙ্গে মিলের প্রধান পার্থক্য হোলো এই যে চিরন্তন ও সার্বজনীন স্বাভাবিক নিয়মের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি মার্কসবাদীদের একথাও মেনে নেননি যে এই নিয়মগুলি সামাজিক বিবর্তনেরই একটি বিশেষ কাঠামোর প্রতিফলন। দ্বিতীয়তঃ যে মিল সমাজতন্ত্রবাদ ও সমবায় প্রথার উপর আস্থাশীল ছিলেন তিনিই

আবার পূর্ণপ্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উপর গভীর বিশ্বাস পোষণ করেছেন। তৃতীয়তঃ বণ্টনব্যবস্থার অসাম্য তিনি লক্ষ্য করেছেন ও তার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বণ্টনব্যবস্থার মূল যে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। তাঁর মতে বণ্টনব্যবস্থা মানুষের তৈরী কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতির বিধান। সুতরাং বণ্টন-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও মিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী।

মূল্যনিরূপণ সম্বন্ধে মিলের ধারণায় মৌলিকত্ব কিছু নেই। এটিকেও তিনি উৎপাদন ব্যবস্থার মত অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধানের অধীন মনে করেছেন, সেই তাঁর আলোচনার দুর্বলতার অন্যতম কারণ। মূল্যনিরূপণের উপর উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাবকে মিল মেনে নিয়েছেন, কিন্তু উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট নয়। উৎপাদনব্যয়ের প্রভাবকে মেনে নিলেও চাহিদা যোগানের উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন মিল।

ম্যালথাস রিকার্ডোর প্রভাব মিলের উপর স্পষ্ট। তাঁর উৎপাদন সম্বন্ধীয় ধারণার ভিত্তি হোলো ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম ও ম্যালথুসীয় জনসংখ্যার তত্ত্ব।

মিল ওয়েজস-ফান্ড তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ শ্রমিকের মজুরীর জন্য মজুত থাকে। কিন্তু তাহলে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হয় যে মজুরীর হার বাড়ানোর চেষ্টা নিরর্থক। তাহলে সমাজ সংস্কার ও ট্রেড ইউ-নিয়ন আন্দোলনের স্বপক্ষে মিলের যুক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই পরে ওয়েজেস-ফান্ড তত্ত্ব পরিহার করে মিল একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় এসে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে পুঁজিপতির ব্যক্তিগত আয়ের তারতম্যের উপর পুঁজির পরিমাণ, তথা মজুরী হার নির্ভর করবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও ত্রুটিপূর্ণ। পুঁজির চাহিদা বা যোগান কিভাবে নির্ধারিত হয় তার কোনও ব্যাখ্যা মিল দিতে পারেন নি। মূলধনের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন না।

মিলের উল্লেখযোগ্য দান হোলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্বে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিনিময়ের একটি সঠিক উপায় মিল দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ফল—তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্বে।

মিল যদি নতুন কিছুই সৃষ্টি করে যেতে না পারতেন তবে তাঁর অর্থনীতির আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর নতুন সৃষ্টি হোলো বণ্টনব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায়। একথা মনে রাখতে হবে যে বাস্তববিচ্যুত বিশুদ্ধ অর্থনীতির সূত্রগুলি মিলের আলোচ্যবিষয় ছিল না। এই সূত্রগুলিকে তিনি বিচার করেছেন বাস্তব প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কল্পিত প্রাকৃতিক বিধানের অলঙ্ঘনীয়তা থেকে ও "ডিসম্যাল সায়েন্স" এই আখ্যা থেকে তিনি অর্থবিদ্যাকে মুক্ত করে তাকে সমাজবিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। যে কথাটি তিনি বলেছেন তা আপাতঃ-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ ছোট একটি কথা, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু মিলের যুগে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিতে কথাটি নতুন এবং তার প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। বণ্টনব্যবস্থার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন

"That is a matter of human institution solely. The distribution of wealth depends upon the laws and customs of society".

যে ব্যবস্থা মানুষ ও সমাজের সৃষ্টি তাতে ত্রুটি থাকতে পারেই এবং সে ত্রুটিও মানুষই ইচ্ছা করলে সংশোধন করতে পারে। এই একটা কথায়ই মিল অর্থনীতির বিধানগুলিকে অবাধ মুক্তি

দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঔচিত্যবোধের প্রশ্ন তুলেছেন এবং নতুন আশার বাণী লোককে শুনিয়েছেন।

এতখানি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও স্মিথ, রিকার্ডো, মার্ক্স, ম্যালথাস্ এঁদের অনেক নীচে মিলের স্থান হোলো অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে কারণ তাঁর নিজের অনেক যুক্তি তিনি নিজেই খণ্ডন করেছেন আপোষের চেষ্টা করতে গিয়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থন ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়েছে। তবে যে যুগে মিল জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে যুগে বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ এতটা স্পষ্ট হয়নি বলে মিলের বক্তব্যের গলদও ধরা পড়েনি। মিল নিজে ছিলেন চির আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শুভবুদ্ধি সব বিরোধেরই অবসান ঘটাবে।

শুধু অর্থনীতিবিদরূপেই মিল শ্রদ্ধা পাননি মানুষ হিসাবে তিনি গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। Principles ছাড়াও "Logic", "On Liberty", "Considerations on Representative Government", "Utilitarianism", "Subjection of Women" প্রভৃতি বই লিখেছিলেন মিল। ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত মহৎ ছিলেন মিল। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বী হার-বার্ট স্পেনসার যখন টাকার অভাবে কাজ চালাতে পারছিলেন না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। একটি চিঠিতে তিনি স্পেনসারকে লিখলেন

"I beg that you will not consider this in the light of a personal favour, though even if it were, I should still be permitted to offer it. But it is nothing of the kind—it is a simple proposal of co-operation for an important public purpose, for which you give your labour and have given your health".

দুটি চিন্তা মিলের জীবনে ছিল—এক তাঁর স্ত্রী। বন্ধুদের মতে স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেম অন্ধ ভালোবাসায় পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি, তাঁর পড়াশুনো। সব অবস্থাতেই তিনি বিদ্যাভ্যাস চালিয়ে গেছেন। পার্লামেণ্টে মানবিক অধিকারের দাবীতে তাঁর সমসাময়িক লোকে-দের তিনি অনেক ছাড়িয়ে গেছেন। এজন্য তাঁর পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু মিল পরোয়াও করেন নি। একজনের সমর্থনের অপেক্ষা তিনি রাখতেন—সে হ্যারিয়েট। হ্যারিয়েটের স্বাস্থ্য কোনও দিনই ভাল ছিল না। বিয়ের সাত বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। হ্যারিয়েটের মৃত্যুতে মিলের শোক সহজেই অনুমান করা যায়। এ সম্বন্ধে মিল আত্মজীবনীতে বলেছেন

"For seven and a half years that blessing was mine; for seven and a half only! I can say nothing. which could describe, even in the faintest manner, what that loss was and is". অত্যধিক পরিশ্রমে মিলের নিজের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। স্নায়বিক দুর্বলতা ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ঘটেছিল। জীবনের শেষ কিছুকাল তিনি ফ্রান্সের অ্যাভিগননে হ্যারিয়েটের সমাধির কাছেই কাটান। এই সময় তাঁকে সেবা করেছেন হ্যারিয়েটের ও মিস্টার টেলরের কন্যা।

উল্লেখযোগ্য এই যে যে বছরে মিলের প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ১৮৪৮ সালে, সেই বছরই প্রকাশিত হোলো মার্ক্সএর কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো এবং অতি অল্প সময়েই তা মিলের প্রচারিত আশার বাণীকে সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন করে দিলো।

রূপ, রেখা ও দর্শন

মুরারি ঘোষ

জ্যামিতির কথা সুরু হলে আরম্ভ করতে হয় গ্রীকদের দিয়েই। যদিও জ্যামিতির সুরু গ্রীসদেশে নয়—জ্যামিতির গুরু হোল গ্রীস ঃ ইউক্লিড আর পীথাগোরাস। জ্যামিতির গোড়ার কথা না পেলেও আসল কথা পাবো গ্রীকদের কাছ থেকেই। গ্রীক মানসের চিত্রকল্প, রেখায়, বৃত্তে, ত্রিভুজে আর ক্ষেত্রে অনন্য ছন্দে আবৃত। জ্যামিতির রসে টুই টুম্বুর গ্রীক মন। প্রথম উপপাদ্যের পাঠ সমাপ্ত করে কোনো এক সংশয়ী ছাত্র নাকি ইউক্লিডকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'এ শিখে আমার কী লাভ হবে?' সংগে সংগে ইউক্লিড তাঁর ভৃত্যকে ডেকে ছাত্রটিকে তিনপেনী দেবার আদেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সরে পড়বার উপদেশ দিয়ে বল্লেন এর থেকে সে কিছু লাভের কড়িও উপায় করে নিতে পারে। এ রকম একটা আদেশ পীথাগোরাসও নাকি শিষ্যদের দিয়ে রেখেছিলেন ঃ "A figure and a step forward, not a theorem and six pence", প্লেটো তাঁর অ্যাকাডেমী থেকে এক ছাত্রকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। তার অপরাধ! সে জ্যামিতি জানতো না। অতঃপর অ্যাকাডেমীর প্রবেশ পথে নিষেধাজ্ঞা লট্‌কানো হোল ঃ "জ্যামিতি জানা না থাকলে এখানে প্রবেশ নিষেধ"।

প্লেটো তখন ষাটের কোঠা পেরিয়েছেন। এমন সময়ে এই অংক পাগলা দার্শনিককে সীরাকিউসের রাজা ২য় ডায়োনিসাস ডেকে পাঠালেন। তাঁর সভাসদদের কিছু জ্ঞানের আলো বিতরণ করা দরকার। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক এরই বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—ফলে এমন রাজ্যময় ধুলোর ঝড় উঠলো যে রাজ আদেশে প্লেটোকে ফিরে যেতে হয়েছিল স্বদেশে। প্লেটো এসেই জ্যামিতির উপপাদ্য খুলে বসলেন। রাজা, তাঁর পরিবারবর্গ, সদস্যবৃন্দ মাটিতে আঁচড় কেটে কেটে মাটির ধুলো দিয়েছিলেন আকাশে উড়িয়ে। কতখানি সত্য মিথ্যা জানি না প্লুটার্কের এই বিবরণ।* তবু গ্রীকদের দেবতারাও নাকি জ্যামিতির সুরে কথা বলতেন। গ্রীসের মূল ভূমির তলায় ছোট্ট দ্বীপ—ডেলোস। ডেলোসের বিখ্যাত হোল অ্যাপোলোর মন্দির। অ্যাপোলো দেব মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত ভবিষ্যৎ বাণী ঘোষণা করতেন। ডেলোসে একবার ভয়ানক মহামারী দেখা দিল। নিরুপায় অধিবাসীবৃন্দ অ্যাপোলো দেবের দুয়ারে ধর্ণা দিলেন। পরিতুষ্ট দেবতা নেপথ্য বাণী দিলেন ঃ তাঁর বেদীর আকার অপরিবর্তিত রেখে আয়তন দ্বিগুণ করে দিতে হবে। বেদীটি ছিল ঘনকের আকারে। আসলে এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন, এমন কি অসম্ভবও বটে। প্রাচীন গণিতজ্ঞদের কাছে সম্পূর্ণ অসমাধিত। তিনটে জ্যামিতিক সমাধান নিয়ে গ্রীকেরা খুব মাথা ঘামিয়েছিলেন, যা বহু গ্রীক জ্যামিতিবিদ সারা জীবন ধরে চর্চাকরেও সমাধান করে যেতে পারেন নি। আসলে এদের কেবল রুলার আর কম্পাস দিয়ে প্রতিপাদন করা যাবে না। অন্যতর জ্যামিতিক উপকরণের প্রয়োজন। এই তিন অসম্ভব জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য ছিল ঃ

(১) ঘনকের দ্বিত্ব করণ
(২) কোনো কোণের সমান তিন ভাগ
(৩) কোনো বৃত্তের পরিমাপে বর্গক্ষেত্র অংকন।

এই তিন অসমাধিত প্রশ্নের প্রভাব গ্রীক জ্যামিতিতে অনেকখানি। এ'দের সমাধানে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন গণিতজ্ঞ গ্রীক জ্যামিতিক নানাভাবে উন্নত করে গেছেন। তৃতীয় প্রশ্নটি ভারতীয়

জ্যামিতিবিদেরাও চর্চা করেছেন ঃ বৌধায়ন, আপস্তম্ভ, কাত্যায়ন। অবশ্য তিনজনেই সঠিক সমাধানে না পৌঁছলেও উত্তরের কাছাকাছি গিয়েছেন বলে দাবী করেন।*

জ্যামিতির কাছে মৃত্যুও তুচ্ছ। এই হোল গ্রীক প্রজ্ঞার পৌরুষ। আর্কিমিডিস তাঁর ভয়াবহ উদাহরণ। মৃত্যুবরণ তিনিই করেছিলেন। কথিত আছে, মার্সেলাস যখন সিরাকিউস আক্রমণ করে দখল করেন তখন আর্কিমিডিস জ্যামিতির এক অংকিত প্রতিপাদ্য নিয়ে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। মার্সেলাসের সৈন্যরা তাঁকে বন্দীকরে নিয়ে যেতে চাইলো। আত্মমগ্ন দার্শনিক প্রতিপাদ্য সমাধান না করে এক চুলও নড়তে চাইলেন না। অতঃপর মূর্খ সৈন্যদের হাতে তাঁর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুবরণ।

ইউক্লিডের ব্যাখ্যা পুস্তক রচনায় প্রোক্লাস (প্রোক্লাস ঃ ৪১২ এ. ডি—৪৮৫ এ. ডি.) উল্লেখ করেছিলেন যে মিশর থেকে জ্যামিতি শাস্ত্র আমদানী করেন আলেস। দিনের আলোয় পীরামিডের যে ছায়া পড়ে তার দৈর্ঘ মেপে আলেস তাদের উচ্চতা বলে দিয়েছিলেন। মাঠের মাঝে একটা কাঠি খাড়া রেখে কাঠি ও তার ছায়ার অনুপাত নিয়ে পীরামিডের ছায়া মেপে তার আসল উচ্চতা নির্ধারণ করেন আলেস। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকেরা অনেকেই জ্যামিতির মিশরীয় উদ্ভাবনার কথা স্বীকার করেছিলেন।

হেরোডাটাসের (৬ষ্ঠ শতাব্দী) রচনা থেকে এক চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় রামেসিস্ খৃঃ পূঃ ১৩০০ শতকের মিশরীয় ফারাও। ফারাও রামেসিস্ প্রত্যেক মিশরীয়কে সমবর্গক্ষেত্র প্রমাণ জমি ভাগ করে দিলেন এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেক জমির রাজস্ব নির্ধারণ করে দিলেন। কিন্তু বন্যার প্রকোপে নীলনদের জলে অনেকেরই জমি ধুয়ে ধ্বংস হোয়ে যেতে লাগলো। ফারাও এর কাছে রাজস্ব মকুবের জন্য আবেদন গেল। এ আবেদন যথাযোগ্য ভাবে বিবেচনা করে দেখলেন তিনি। এ ধরণের আবেদন প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল মিশরে। প্রতি বছর নীলনদের তীরে কোনো না কোনো স্থান বন্যায় ভেসে যেতই। নষ্ট জমির পরিমাপে আনুপাতিক হারে রাজস্ব দেবার ব্যবস্থা হোল। ক্ষেত্র মাপার প্রসংগে এবং রাজস্ব নির্ধারণে মিশরে জ্যামিতির উদ্ভাবনা। ভারতে এর ইতিহাস আবার অন্য রকমের।

মিশরীয় গণিতের প্রধান উৎস হোল প্যাপীরাস পুঁথি। এরকম একটি উৎস হোল আহমোসের প্যাপীরাস। রিন্ড প্যাপীরাস নামেই খ্যাত। এ. হেনরী রিন্ড ১৮৫৮ সালে মিশর থেকে তা ক্রয় করে আনেন। এর ৮৫টী গাণিতিক প্রশ্নের মধ্যে ২০ টাই হোল (৪০ থেকে ৬০ নং প্রশ্ন অবধি) জ্যামিতি ও ক্ষেত্র গণিত সংক্রান্ত। এখানে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করা হয়েছে ত্রিভুজের ভূমি ও যে কোনো বাহুর অর্ধেকের গুণফলে। (খুব লম্বা ও সরু ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই এ সূত্র কেবল আসন্ন মানে প্রযোজ্য।) ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগে জ্যামিতির প্রকাশ মাধ্যম সবচেয়ে বেশী কাজে লেগেছে পীরামিড রচনায়। অতি সাধারণ জ্যামিতিক চেতনায় পীরামিড এক আশ্চর্য অবদান। পীরামিডের প্রস্তরের আয়তন নির্বাচনে, ভেতরকার গঠন পরিপাট্যে, বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণে ফলিত জ্যামিতির চরম প্রয়োগ লক্ষ্য করা চলে। মস্কোতে রক্ষিত গোলেনিশ্‌চেভ প্যাপীরাসে (গোলেনিশ্‌চেভ কর্তৃক সংগৃহীত) প্রাচীনতম জ্যামিতির জটিলতর উদাহরণ রয়েছে। রিন্ড প্যাপীরাসের থেকেও এর উদাহরণগুলি জটিল। এক ছিন্নাগ্র পীরামিডের আয়তনের পরি-

* James Jeans: Growth of the Physical Sciences.
* The Sciences of Sulba: Bebhuti Bhusan Dutta.

মাপ এতে যা কষে দেওয়া আছে আধুনিক গবেষণায় তা খুব আশ্চর্য আবিষ্কার। উদাহরণটি এক উন্নত প্রণালীর গাণিতিক সমাধান। সার্টন (জর্জ সার্টন) অভিহিত গ্রীক জ্যামিতির চরম ফল-শ্রুতি এই উদাহরণ। অনেক ইতিহাসকার স্বীকার না করলেও পাঁথাগোরীয় সমকোনী ত্রিভুজের প্রতিপাদ্য মিশরী গণিতজ্ঞদের অজ্ঞাত ছিল না। ত্রিভুজের বাহুর পরিমাণ ৩, ৪ আর ৫ হোলে ত্রিভুজটি নিঃসন্দেহে সমকোনী ত্রিভুজ হবে এই জাতীয় উদাহরণে তারা ওয়াকিবহাল ছিল।

মিশরের জ্যামিতি বেত্তাদের একাংশকে ডিমোক্রিটাস হারপেডোনাপ্টে বলে উল্লেখ করেছিলেন। শব্দটির অর্থ হোল রজ্জু-ধারক। রজ্জু বা দড়ি ধরে যখন জমি মাপা হোত তখন জমির মাপ থেকেই জ্যামিতি। 'জ্যা' শব্দের অর্থ ভূমি বা পৃথিবী, মিতি হোল পরিমাপ। ইংরাজী জিওমেট্রি শব্দের একই বুৎপত্তিগত অর্থ। এই দড়ি বা সুতো ধরে মাপা থেকেই যে জ্যামিতির উৎপত্তি এমন আশ্চর্য উদাহরণ আমাদের দেশেও মিলবে। জৈন শাস্ত্র গ্রন্থ "স্থানাংগ সূত্রে" জ্যামিতির পরিভাষা রয়েছে 'রজ্জু'।* জ্যামিতির নিয়মাবলী যে সূত্রে শ্লোকাকারে ছন্দোবদ্ধ থাকতো তাকে বলা হয় শুল্ব সূত্র।* বৌধায়ন আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি ৭ জন ঋষি রচিত শুল্ব সূত্রের মধ্যে আমরা বৈদিক যুগে হিন্দু-জ্যামিতি চর্চার বিভিন্ন খবর পাবো। শুল্ব বা রজ্জু কথাটার অর্থ একই—সুতো বা দড়ি। যজ্ঞবেদীর পরিমাপ ও তত্ত্বগত প্রয়োজনের দিক থেকে রেখা, বৃত্ত আর বিন্দু নিয়ে যে বিদ্যা এই শাস্ত্রই শুল্ব সূত্রের অন্তর্গত। রজ্জু ছিল একমাত্র প্রয়োজনীয় উপকরণ যা দিয়ে জ্যামিতিক অংকন সম্ভব হোত। রজ্জুর দুপ্রান্ত লম্বা করে ধরে সরলরেখা আঁকা যায়। আবার এক প্রান্ত কেন্দ্র করে, কিছু অংশ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত ও আঁকা যায়। রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ নিয়েই তখন জ্যামিতির প্রাথমিক চর্চা। সমকোণের জ্ঞান পাঁথাগোরাসের বিখ্যাত সমকোনী ত্রিভুজ-উপপাদ্যের তত্ত্বেই পরিচিত ছিল। সমকোনী ত্রিভুজ তত্ত্বের প্রতিপাদ্য (সমকোনী ত্রিভুজের অন্য দুই বাহুর বর্গের যোগফল অতিভুজের বর্গের সমান) স্বতন্ত্র ভাবেই ভারতীয় শুল্ব সূত্রে উদ্ভাবিত হয়েছিল। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রত্যেকেই স্বরচিত শুল্বসূত্রে বিবৃত করে গেছেন এই তত্ত্ব। বৌধায়ন (৮০০ খৃঃ পূঃ) সূত্রের যে ব্যাখ্যা আছে তার অনুবাদ হোল ঃ এক আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপরকারক্ষেত্র তার দৈর্ঘ ও প্রস্থের উপরকার ক্ষেত্রের যোগফলের সমান। পাঁথাগোরাস কেবল এই আয়তক্ষেত্র আর কর্ণের স্থানে সমকোনী ত্রিভুজ ও অতিভুজের ধারণা এনেছেন। গ্রীকগাণিতের বিখ্যাত ইতিহাসকার "টমাস হীথের" বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা চলে ঃ

Though this is the proposition universally associated by tradition with the name of Pythagoras, no really trustworth, evidence exists that it was actually discovered by him (History of Greek Mathematics: Vol. I: Thomas Health).

কর্ণের দৈর্ঘ যদি ৫ একক হয় আয়তক্ষেত্রের দুই বিভিন্ন বাহুর দৈর্ঘ হবে ৩ ও ৪, অর্থাৎ গাণিতিক ভাষায় ঃ $৩^২+৪^২=৫^২$। শুল্বকারগণ এরকম আরো অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন ঃ

$$১২^২+৫^২=১৩^২$$
$$১৫^২+৮^২=১৭^২$$
$$৭^২+২৪^২=২৫^২$$ ইত্যাদি *

* History of Hindu Math: B. Dutta, A. Singh.
* The Sciences of Sulba: B. Dutta.
* Ancient Indian Math & Vedha : L. V. Gurjar

* শুল্বকারগণ প্রথমে গণনা ও পরিমাপের নিয়মাবলী বিবৃত করেছেন। তারপর দিয়েছেন বিভিন্ন বেদী নির্মাণের (সৌমিক বেদী, পৈতৃক বেদী প্রভৃতি) প্রণালী। বিভিন্ন বেদী আবার বিভিন্ন আকারের ইঁট সাজিয়ে রচিত হবে। কোনটা আয়ত, কোনটা রম্বস্, কোনটা সমবাহু ট্রাপিজিয়ম, সমকোনী ত্রিভুজ। নানা আকারের ইঁট একই বেদীতে কিংবা বিভিন্ন বেদীতে ব্যবহৃত হোত। বেদীরচনায় জ্যামিতিক অংকন প্রণালীর যথেষ্ট সুসাধ্য জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্মীয় অনুশাসনে, রীতিগত নিয়মানুগ অনুশীলনে জ্যামিতির উদ্ভাবনা ভারতবর্ষে। তবু বিমূর্ত মননে শুল্বশাস্ত্র ভারতে পরিণত বিজ্ঞানে পরিণত হয় নি—বরংচ এক উপলব্ধ শিল্পশাস্ত্রে জ্যামিতির প্রয়োগ হয়েছিল। তবু তত্ত্বের দিক থেকে তার অনেক কিছু স্বীকার্য (Postulates) ছিল, প্রতিপাদ্যও ছিল। নীচের তালিকাটি বৈদিক জ্যামিতির মৌলিক তত্ত্বের দিক তুলে ধরবে ঃ

(১) পাঁথাগোরাস খ্যাত সমকোণী ত্রিভুজের উপপাদ্য।
(২) নির্দিষ্ট রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে লম্ব ও লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অংকন।
(৩) আয়তক্ষেত্রের সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের বাহু নির্ণয়।
(৪) বর্গক্ষেত্রের সমক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোন সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম রচনা।
(৫) জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যে ২এর বর্গমূল নির্ণয়।
(৬) বর্গক্ষেত্রের সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত নির্মাণ।
(৭) II (পাই) অর্থাৎ কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় ইত্যাদি।

শুল্ব শাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল বৈদিক যুগে (২০০০ খৃঃ পূঃ)। তারপরেও স্বতন্ত্র ভাবে ভারতীয় গাণিতিকেরা জ্যামিতি চর্চা করেছিলেন। আর্যভট (৪৭৬ খৃঃ), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃঃ) ও ভাস্করাচার্যের (১১৫০) গবেষণা উল্লেখযোগ্য। আর্যভটের প্রতিপাদ্য ছিল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের, সমাজতীয় ত্রিভুজের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত গঠন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়। জ্যামিতি শাস্ত্রে আর্যভট ও ভাস্করাচার্যের থেকে ব্রহ্মগুপ্তের চর্চা আরো ব্যাপক। ব্রহ্মগুপ্তের প্রতিজ্ঞা (প্রোজিশন) বিশেষ অনুশীলন সাধ্য। তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল ঃ ত্রিভুজের বা চতুর্ভুজের উচ্চতা নির্ণয় পদ্ধতি। যে কোন চতুর্ভুজের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয়। সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয়ের অনুসমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়মের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় ইত্যাদি।* ভাস্করাচার্য জ্যামিতির চেয়ে বীজগণিত অনুশীলন করেছিলেন বেশী। জ্যামিতি চর্চায় তাঁর মৌলিক গবেষণা আর্যভট, ব্রহ্ম গুপ্তের সমপর্যায়ে নয়।

ভারতীয় ও গ্রীক জ্যামিতির প্রসংগগত আলোচনায় দুদেশের বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় পাবো। ভারতীয় জ্যামিতি গ্রীক মত যথাযথ প্রতিপাদন সিদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতা লব্ধ পর্যবেক্ষণ-সাধ্য হলেও ভারতীয় জ্যামিতির বহিরংগ রূপ পরীক্ষা সিদ্ধ হয়নি, কেননা ইউক্লিডীয় নিয়মে যথাযথ অবরোহ প্রণালীতে জ্যামিতি সংবদ্ধ নয়। শ্লোকে নিবদ্ধ বলেই বলা চলে জ্যামিতিক উপপাদ্যের পরীক্ষাসিদ্ধ প্রতিপাদন সম্ভব হয় নি, এও এক কারণ। তবু শ্লোকগুলিতে লক্ষ্যনীয় হোল, গাণিতিক প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের সংহততম রূপ। শ্লোক রচনার খাতিরেই যে ভারতীয় জ্যামিতির এই অবস্থা—এ স্বীকার্য নয়। শ্লোকাকার রচনা তো প্রকাশ মাধ্যম মাত্র। সংস্কৃতির এক অন্যতম বিশিষ্ট হাতিয়ার প্রকরণ নয় উপকরণ মাত্র। তবু এই উপকরণ নির্বাচনে ভারতীয় মননের এক বিশিষ্ট ঝোঁক বা স্বজ্ঞার (ইনটুইশান) আভাস পাওয়া যায়। আসলে ভারতীয় মন চরম বিমূর্তবাদে আশ্রিত। এই বিমূর্তবাদ তাকে বাস্তব রূপলোক থেকে

* Sciences of Sulba: B. Dutta.
* Ancient Indian Math & Vedha: L. V. Gurjar.

পরম রূপাভাসে আকর্ষণ করেছে। মূর্ত রূপ থেকে অরূপের ধ্যানে আশ্রয় দিয়েছে। ইউক্লিডের জন্ম ভারতীয় গণিতে সম্ভব হয়নি পক্ষান্তরে আবির্ভূত হয়েছে পরম দার্শনিক ভাস্করাচার্যের। গণিতের বিজ্ঞানকে যিনি পরম সার্থক গাণিতিক দর্শনে রূপায়িত করলেন। বীজগণিতের ইতিহাস চর্চায় কিংবা উপকরণ বা প্রকরণ প্রসংগে একই অনুমেয় (ইন্‌ফারেন্স) পরিলক্ষিত হবে।

গ্রীক মানসে যখন বিমূর্তন উপলব্ধির চেয়ে বিশিষ্ট রূপের অভিজ্ঞানই বাস্তবতর তখন সেই বিশিষ্ট গাণিতিক-প্রজ্ঞায় ইউক্লিডের আবির্ভাব স্বাভাবিক ও সহজতর। ভারতীয় গাণিতিকেরা সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিপাদ্য কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ অনুমেয় হিসেবেই বিবৃত করেছেন কিন্তু গ্রীক পীথাগোরাস যুক্তি ও চিন্তার অবরোহে তার নির্ধারিত রূপ পরীক্ষাসিদ্ধ করেছেন। গ্রীক মানস বিচারে রাধাকৃষ্ণনের বক্তব্য নিশ্চয় এখানে অনুল্লেখ্য হবে না ঃ

"What is the distinctive of Greece was their faith in the power of human reason. The attempt to give rational justification for their ethical and religious views. Their mind was of a dialectical order. Restricting the field of human thought, the Greeks substitute the rational for the real, the scientific for the metaphysical point of view. (Radhakrishnan: East and West)

যুক্তিনিষ্ঠ গ্রীক মন তর্কশাস্ত্রের বিজ্ঞান যেমন রচনা করেছে তেমনি বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্রও তাদের রচনা। জ্যামিতি হোল প্রথম যুক্তিনিষ্ঠ শাস্ত্র যার প্রকাশভংগী যতখানি বিজ্ঞান ততখানি শিল্পসম্মত ও বটে। চিন্তার ঐক্যে ও অনুপাতে, তত্ত্বের সুস্থনতায় (হারমোনি) ও ক্রমবিকাশে গ্রীক জ্যামিতির সংবন্ধ শিলারূপ গ্রীক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম অবদান। তাই গ্রীক জ্যামিতির সাফল্য বিচার তার যথাযথ পটভূমিকাতেই লক্ষ্যণীয়। ইউক্লিডের নামের সংগে ইউক্লিড কথিত শাস্ত্ররূপ অংগাংগী সম্পৃক্ত; কেননা, জ্যামিতির দ্বিতীয় নামই হোল ইউক্লিড। অথচ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংরচনার মৌলিকত্বের দায় ইউক্লিডের নয়। প্রোক্লাস রচিত ইতিহাস থেকে গ্রীসে জ্যামিতির উদ্ভাবনা ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব জানা যায়। জানা যায় একাধিক জ্যামিতিবেত্তার সফল-সাধনার কাহিনী। প্রোক্লাসই বলেছেন, মিশরের রজ্জুধারকদের তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রথম খবর বয়ে আনলেন আলেস। মিলেটাস নগরীতে ছিল তাঁর বিদ্যালয়। প্রথম শ্রেণীর ভ্রমণকারী ছিলেন তিনি। মিশরে শিখেছিলেন জ্যামিতি ও মেনস্যুরেসান, ব্যাবীলনে শিখেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যা। তখনকার জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানে তাঁর নিখুঁত দখল ছিল। সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ছিল তাঁর (২৮শে মে, ৫৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী)। জ্যোতির্বিদ্যার আংকিক সূত্রে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন। জ্যামিতির তত্ত্বে তাঁর দান হোল ঃ

(১) ব্যাস দ্বারা বৃত্তের সমদ্বিখণ্ডন।
(২) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন বাহুদ্বয় সমান।
(৩) দুইটি পরস্পরছেদী সরলরেখার বিপ্রতীপ কোণগুলি সমান।
(৪) দুইটি ত্রিভুজের দুইটি কোণ ও একটি বাহু পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।
(৫) অর্ধবৃত্তের উপর অংকিত কোণ সমকোণ।

আলেসের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন পীথাগোরাস। পীথাগোরাসকে আলেস বিভিন্ন দেশবিদেশ ঘুরে জ্ঞান সংগ্রহের উপদেশ দিয়েছিলেন। পীথাগোরাসও যথেষ্ট ভ্রমণ করেছিলেন। ২২ বছর তিনি মিশরে থেকে গণিতের পাঠ নিয়েছেন। ১২ বছর কাটিয়েছেন ব্যাবিলনে। গ্রীক

সংখ্যাতত্ত্বের জনক তিনি। অবশ্য সংখ্যাবিজ্ঞানে যতটা তাঁর স্বকীয় দার্শনিকতা ছিল ততটা বিজ্ঞানে ছিলনা। বরঞ্চ তাঁর মৌলকত্ব জ্যামিতি বিজ্ঞানে। প্রাথমিক জ্যামিতি শাস্ত্রের স্রষ্টা হিসেবে পীথাগোরাস এক উল্লেখযোগ্য নাম। জ্যামিতির প্রচলিত তত্ত্ব ও তথ্যকে তিনিই প্রথম রীতিবদ্ধ শাস্ত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল ঃ

(১) ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।
(২) সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের যোগফল।
(৩) নির্দিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিমাপে বর্গক্ষেত্র অংকন। ইত্যাদি।

জ্যামিতিক অনুবাদ ও অমূলদরাশি মালার জ্যামিতিক সমস্যাবলী নিয়ে আংকিক প্রতিপাদ্য পীথাগোরাসের চর্চার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্যামিতি চর্চায় পীথাগোরাসের নিষ্ঠা ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছেন প্রোক্লাস। প্রোক্লাস বলেছেন ঃ

Herein I emulate the Pythagorians who even had a conventional phrase to express what I mean, "a figure and a platform, not a figure and six pence", by which they implied the geometry which is deserving of study is that, which at each new theorem, sets up a platform to ascend by, and lifts the soul on high instead of allowing it to go down among sensible objects and so become subservient to the common needs of this mortal life. (হীথ কর্তৃক উদ্ধৃত ঃ হিস্ট্রি অব গ্রীক ম্যাথ)।

পীথাগোরাসের পরের একশো বছর জ্যামিতি গবেষণায় বিশেষ উর্বরকাল। এযুগে জন্মেছিলেন হিপোক্রেট্‌স্ (৪৪০ খৃঃ পূ)। পীথাগোরীয়ানদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। গ্রীক গণিতের ওপর তিনি প্রথম পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। গণিতজ্ঞ অয়ডেমাস (৪৪০ খৃঃ পূ) তৎকালীন গণিতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য মত জানা যায় যে সাধারণ জ্যামিতির পূর্বোল্লিখিত তিনটি অসাধ্য প্রতিপাদ্যের অন্যতম, বৃত্তের বর্গক্ষেত্র নির্মাণের সমাধান হিপোক্রেটস্ দিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য যে প্রতিপাদিত সমাধান উল্লেখ করা আছে আয়ডেমাসের গ্রন্থে তার সমাধান মোটেই স্বীকার্য নয়, টমাসহীথ তাই এ সমাধান হিপোক্রেটসের গবেষণা নয় বলেই মনে করেন। কেননা সাধারণ জ্যামিতিক জ্ঞানে আর রুলার ও কম্পাস দিয়ে এই তিনটি প্রতিপাদ্যের কোনটার সমাধান সম্ভব নয়। আসলে হিপোক্রেট্‌সের মন্তিস্যানা জ্যামিতির প্রথম পাঠ্য পুস্তক রচনায়। এ পর্যন্ত জ্যামিতি গবেষণায় প্রতিজ্ঞা যা সমাধিত হয়েছে তা ইউক্লিডের গ্রন্থে তিন ভাগের এক ভাগ সংগৃহীত হবে। অতএব হিপোক্রেট্‌সের হাতেপাঠ্যপুস্তক রচনার প্রাথমিক মালমসলার অভাব ছিলনা। হিপোক্রেট্‌সের তথা থেকেই ইউক্লিড তাঁর বিখ্যাত এলিমেন্টের (এলিমেন্ট্‌স্ অব জিওমেট্রী) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অংশবিশেষ রচনা করেন।

প্রোক্লাসের বিবরণ থেকেই জানতে পারা যায়, হিপ্পিয়াস, এ্যান্টিকোন, ব্রাইসনের নাম। এদের পরই আসন প্লেটো। জ্যামিতির বিষয়বস্তুগত কোনো নতুন তত্ত্বের আবিষ্কারক প্লেটো নন। কিন্তু দার্শনিক হিসেবে এতখানি গণিতসর্বস্ব মনের অধিকারী আর কোনো গ্রীক মনীষী ছিলেন কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন জ্যামিতিক সংজ্ঞার্থ (Definition) রচনা করে জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যের প্রাথমিক স্বীকার্যগুলি (Postulates)

স্থাপন করে প্লেটো জ্যামিতির গোড়ার বাঁধুনি তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্লেটোর প্রাথমিক অনুশাসনের ওপর এলিমেন্টারী জ্যামিতির উপরিতল (সুপার স্ট্রাক্চার)। বিন্দু, গোলক (স্ফিয়ার), রেখা, বৃত্ত, প্রভৃতির অধুনা প্রচলিত সংজ্ঞার্থ প্লেটোর রচনা। জ্যামিতিক তত্ত্বে প্লেটোর মনোভাব আগেই বর্ণনা করেছি। বাস্তব পৃথিবীর প্রয়োজনের খাতিরে প্লেটো তাঁর কোনো তত্ত্বকেই কাজে লাগাতে চাননি। জ্ঞানের নিরাসক্ত আদর্শে বস্তুজগতের ভেজাল অবাঞ্ছনীয়। এই মনোভাবেই তিনি নিন্দা করে গিয়েছিলেন অয়ডোক্সাস ও মেনেক মাসের। দুজনেই প্লেটোর পরম শিষ্য। কিন্তু দুজনেই জ্যামিতিকে পার্থিব সমস্যার সমাধানে লাগাতে চেয়েছিলেন। মেনসুরেসান প্রতিপাদ্যে জ্যামিতির প্রয়োগ (অয়ডোক্সাস), কিংবা ঘনকের দ্বিত্বকরণ চেষ্টায় (মেনেকমাস) প্লেটোর সম্মতি মোটেই ছিলনা। কেননা ঃ

"... the good of the geometry is thereby lost and destroyed as it is brought back to things of sense instead of being diverted upward and grasping at eternal and incorporeal images (Plutarch: Plato)

অ্যারিস্টটলও জ্যামিতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাল যাপন করেছিলেন,' গুরুর মতই গণিত বিজ্ঞানে জ্যামিতির গুরুত্ব বুঝেছিলেন। জ্যামিতিক যুক্তির অবরোহিক প্রণালী তাঁর দর্শন প্রজ্ঞায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে জ্যামিতির যথাযথ পাঠ্যপুস্তক রচনার দিকে তাঁক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিল তাঁর। জ্যামিতি ততদিনে এক পরিণত বিজ্ঞানে সম্প্রসারিত। থুইে ডিয়াসের জ্যামিতি ছিল তাঁর অধ্যাপনার গ্রন্থ।

গ্রীক গণিতে ইউক্লিডের আবির্ভাব এক নির্দিষ্ট সরল রেখা বেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই সরল রেখা ধরে বিজ্ঞানের পথযাত্রায় এক অবধারিত কার্যকারণ যোগের সূত্রে গাঁথা যায়। ইউক্লিডের আবির্ভাব তারই অনিবার্য প্রমাদ। তাঁর 'এলিমেন্টের' ১৩টা খণ্ড। যদিও আরবদের অনুবাদে ১৫টা খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায় তবু শেষ দুই খণ্ড নিশ্চিতভাবে ইউক্লিডের রচনা নয়। ১৩টা খণ্ডের বিষয় বস্তু রচনায় ইউক্লিড তাঁর পূর্বাচার্যদের বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করেন। 'এলিমেন্টসের' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পীথাগোরীয় জ্যামিতির সারমর্ম। তৃতীয়খণ্ড ঃ হিপোক্রেটসের রচনা। পঞ্চম খণ্ড অয়ডোক্সাস রচিত। চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশখণ্ড পীথাগোরাস শিষ্যদের বিন্যাস। সপ্তম থেকে নবম খণ্ড মূলদ রাশিমালায় প্রতিপাদিত জ্যামিতিক সমাধান, থেটেটাসের গবেষণা। দশমখণ্ড মূলত ইউক্লিডের নিজস্ব, অমূলদ রাশিমালার জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য।

ইউক্লিডের জ্যামিতির যুক্তির উপরিতল অনেকগুলি নির্দিষ্ট স্বতঃ সিদ্ধের ভিত্তির ওপরে সংগঠিত এবং মোট তিন প্রাথমিক উপাদানে তাঁর যুক্তির প্রাসাদ নির্মাণ—বিন্দু, রেখা ও ক্ষেত্র (তল)। বিন্দু থেকে রেখা, রেখা দিয়ে ক্ষেত্র সৃষ্টি। আর ক্ষেত্রের সীমায় এসেই ইউক্লিডের সিদ্ধি। তার পরের চর্চা হোল অন্যতর সাধনা। সিদ্ধিও অন্যরূপ। প্রাথমিক স্বতঃসিদ্ধ গুলি ইউক্লিডীয় নিয়মে অবশ্য স্বীকার্য। কেননা ইউক্লিডের সাফল্য এই স্বীকার্য-নির্ভর। দুটো একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায় ঃ যেমন, জ্যামিতির প্রতিটি প্রতিজ্ঞার আগেই জেনে রাখতে হবে

(১) অন্তত দুই বিন্দু দিয়ে এক রেখা,

(২) এক সরলরেখায় নয় এমন তিনটে বিন্দু দিয়ে একটা ক্ষেত্র,

(৩) ক্ষেত্রের কোন একটি রেখার প্রত্যেকটা বিন্দু সেই ক্ষেত্রে অবস্থিত।

এমনি আরো অনেক প্রাথমিক স্বীকার্য বস্তুর ওপর প্রাথমিক জ্যামিতির স্থির—নির্ভরতা। ২২০০ বছর ধরে এই জ্যামিতি অপরিবর্তিত ভাবে আমরা চর্চা করে এসেছি—এখনো করে যাবো।

পৃথিবীর পরিমাপ থেকে জ্যামিতির সুরু হয়েছিল। পৃথিবীর মাটির দ্বি-মাত্রিক (সমতলীয় ঃ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সহ) অবস্থান আমাদের স্থূল জ্ঞানে ও ব্যবহারিক জীবনে পরম সত্য। দ্বি-মাত্রার সীমিত ধারণায় ইউক্লিডের প্রসার প্রাথমিক জ্যামিতির শেষ সীমায় এসে থেমেছে। তাই ইউক্লিডের অনন্যতা কেবল যুক্তির অবরোহে নয়, সত্যের সীমা অন্বেষণেও। ইউক্লিডের জ্যামিতি তত্ত্ব ও তথ্যের প্রথম আপেক্ষিক মূল্য ঘোষণা করলো। নির্দিষ্ট কতকগুলি স্বীকার্য (প্যাস্টুলেট্স্) ও স্বতঃসিদ্ধের আপেক্ষিক মূল্যায়ণে ইউক্লিডের যুক্তির সিদ্ধি। এই স্বীকার্য গুলো তুলে নিলেই ইউক্লিডের প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়াবে হেত্বাভাস বা ফ্যালাসী। তাই দ্বি-মাত্রার বাঁধন ভেঙে জ্যামিতিও বহুমাত্রিক হয়েছে বর্তমানে। এমনিতেই যখন আমরা ঘনবস্তুর জ্যামিতি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) চর্চাকরি তখনই আমাদের ইউক্লিডের জগত থেকে সরে আসতে হয়। দ্বি-মাত্রিক পটভূমিতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সীমায় ত্রিমাত্রিক (ঘনবস্তুর) জ্যামিতি চর্চা ইউক্লিডের নিয়মে সাধ্যায়ত্ত নয়। এমনি করেই ইউক্লিডের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ছাড়িয়ে তল বা space এর সংখ্যা বাড়িয়ে বহুমাত্রার জগতে আমরা পৌঁছোতে পারি। সেখানে জ্যামিতির আর এক রাজ্য—জটিলতর তার নিয়ম কানুন। ইউক্লিড সেখানে অপ্রযোজ্য।

গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিতাই বসু

যে লেখক 'অতসীমামী' লিখে বাংলাসাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করলেন, তিনি যে অন্য এক সুরে, অন্য ছাঁদে আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন, তা নিতান্তই বিস্ময়কর। অবশ্য ঊনিশ শতকের শেষ কয়েক দশক থেকে সুরু করে বিশ শতকের মধ্যাতিরিশ পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজ-আর্থনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন ও রবীন্দ্র-শাসিত সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী আমাদের চিন্তাধারাকে আমূল পরিবর্তনের দিকে নিয়ে চলেছিলো এবং এ দেশের ইতিহাসে এই যুগের যে কোন কাহিনী রোমাঞ্চকর হলেও বিস্ময়কর নয়।

তবু এই লেখকের মানসিক রুচি বা বিশিষ্ট মানসিকতায় আশ্চর্য হতে হয়। 'অতসীমামী'র কাব্যিক ব্যঞ্জনা থেকে 'সরীসৃপের' বিষাক্ত পংকিলতায় তাঁর জীবনদর্শন বিবর্তিত হয়েছে মাত্র চার বছরের মধ্যেই। যে সাহিত্যিকের জীবন তাঁর শিল্পের সংগে একীভূত এবং শিল্পই তাঁর জীবন, তিনিই সার্থক জীবনশিল্পী এবং পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসের দিকপাল-দের সংগে তুলনা না করেও একথা নিঃসংশয়-প্রতিষ্ঠ যে মাণিক বাবু জাত-শিল্পী, জীবনশিল্পী। জীবনের প্রশান্ত সৌন্দর্যের উদ্‌ঘাটন, জীবনের সংগে জীবন যোগ করে এক মহাজীবনের সিম্‌ফনি বা মহাসংগীত ফুটিয়ে তোলা, সৃষ্টির আনন্দে হারিয়ে গিয়ে সার্থক স্রষ্টাসুলভ পুলকিত-বিস্মিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা খন্ড মুহূর্তকে শাশ্বত মূল্যে বেঁধে দেওয়াই ক্লাসিক সাহিত্যের স্বরূপ এবং একমাত্র এই অর্থেই উপযুক্ত প্রতিভা থাকলেও মাণিক বাবু ক্লাসিক শিল্পী নন। জীবনের সব কিছুকে ভালবেসে সাহিত্যরচনা করতে গেলেই তিনি একদেশদর্শিতায় চিহ্নিত হবেন—যেমন আমাদের সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখ্য উদাহরণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা মানবচরিত্রের অন্ধকার রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় অনুভূতিকে উপলব্ধি করে বাস্তব পরিবেশনে অনীহা দেখান, যার বিপরীত-কোটিতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সগোত্রীয়েরা। এঁরা জগতের সব-কিছুর মধ্যেই দেখেন এক সূক্ষ্ম-জটিল ঘটনা, যে কারণে কর্তার রুচি নিয়ন্ত্রিত হয় এক বংকিম পদ্ধতিতে, কর্মের গতি সূচিত হয় এক কুটিল-বিসর্পিল রীতিতে।

প্রশ্ন হতে পারে, মাণিকবাবু কেন এই পথ বেছে নিলেন? আংগিকের কথা বাদ দিলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কল্লোলীয়েরা আমাদের সাহিত্যে যখন ঝোড়ো হাওয়ার সূত্রপাত করে-ছিলেন, যখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাসাহিত্যের প্রতিটি স্রষ্টাই জীবনের গভীর তলদেশ থেকে পংকিলতার অভিজ্ঞতা নিয়ে সৃষ্টির ভান্ডার পূর্ণ করে চলেছিলেন, যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পর্ব সমাপ্তি-ঘোষণার দিকে, সেই রিক্তঋতুর লগ্নে মাণিকের আবির্ভাব ঘটলো। যিনি 'গোত্রে ও ধর্মে কল্লোলীয়, স্বপ্নে ও সাধনায় কল্লোলেরই পরিণাম।'

মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অসংগতি তাঁর চোখে পড়েছিলো। বিশেষত নাগরিক জীবনের কুশ্রীতা, স্বার্থপরতা ধনীর অত্যাচার, নির্মম দারিদ্র্য—এককথায় সর্বপ্রকার নোংরামিকে তিনি এক অসহ্য ক্ষোভে ব্যক্ত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। 'সিঁড়ি' গল্পে বাড়ীওয়ালা মানবের সংগে ভাড়াটে মেয়ে ইতির হৃদয়ঘটিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নেই কোনো কাব্যিক ব্যঞ্জনা অথবা রোমান্স। ইতির টাকা ধার চাওয়া এবং মানবের এই স্বার্থপরতার সুযোগ নেওয়া এই গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পটির তুলনায় নরেন্দ্র ঘোষের 'সিঁড়ি' গল্পটি মধ্যবিত্ত ক্লান্তির বাস্তব প্রতিবেদন হলেও

উৎকৃষ্টতর রচনা। মাণিকবাবুর ধারণা ছিলো যে, আমাদের প্রেম-ভালবাসা-কর্তব্যবোধ অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত এবং আমাদের চিত্তবৃত্তির নিয়ামক হিসাবে টাকার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। অথচ ধন ও ধনীর ওপর তাঁর বীতস্পৃহা ও বৈরাগ্য বাংলাদেশের পাঠকের কাছে অজানা নয়। 'কুষ্ঠ রোগীর বৌ' গল্পে তিনি বলছেন

ঃ একথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপি চুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মত মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানি। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর ঃ সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষরে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে। ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

প্রকৃতপক্ষে ধনবন্টন-ব্যবস্থার বৈষম্যই যে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার প্রধানতম গলদ, এ সত্য মাণিকের হাতেই প্রথম সার্থকভাবে ধরা দিয়েছিল। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবমন্ডলীর দুর্দশার মূল কারণ বিকৃত সমাজ-শাসন-পদ্ধতি এবং কোনোমতে বেঁচে-থাকার দায়সারা অস্বস্তিকর রীতি। আমাদের বিচার ও শাসনের গন্ডীর মধ্যে যে সামাজিক মুক্তির আত্মসন্তুষ্ট ঘোষণা প্রচলিত, তার অন্তঃসারশূন্যতাকেও লেখক কয়েকটি গল্পে ফুটিয়ে তুলে-ছেন। 'নেড়ী' গল্পে তারা ও তার বিধবা মেয়ে মনার জীবনে যে বিপর্যয়ের অন্ধকার নেমে এলো দারিদ্র্যের রন্ধ্রপথে, ঠিক সেই পথেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এলো হৃদয়পন্ডিত, যার হৃদয়-হীনতায় নগরের পতিতালয়ে মনার আশ্রয় মিলেছে আর উপেক্ষিতা তারা হাসপাতালের রোগ-শয্যায় শুয়ে পাতাল-জীবনের ছবিটিকে স্বগতোক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছে। এই হৃদয়পন্ডিতের প্রসংগে মনে পড়ে যায় 'নমুনা' গল্পের কালাচাঁদের কথা। তবে, কালাচাঁদ যে নিরীহ গরীবের মেয়েটিকে জোর করে ধরে পাপ-ব্যবসায়ে লিপ্ত করতে পতিতালয়ে নিয়ে এসেছিলো, কোনো এক দুর্বল মুহূর্তের অনুভূতিতে সে তাকে পত্নীত্বের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলো। মেয়েটির ঘরে একটি পরপুরুষের অস্তিত্ব এবং হাতের মধ্যে 'মন্দোদরী'র কাছ থেকে 'এক তাড়া নোট' প্রাপ্তি তার বাসনাকে পরিবর্তিত করেছে।

'বিবেক' গল্পে লেখক আমাদের বিবেকের ওপর একটা অম্লমধুর কটাক্ষ করেছেন। অশ্বিনী ধনী, তবু তার ঘড়ি ফিরিয়ে দিলো ঘনশ্যাম কিন্তু শ্রীনিবাস দরিদ্র বন্ধু হলেও তার মনিব্যাগটি সে ফেরৎ দেয়নি। 'আপিম' গল্পের স্বার্থপরতার নির্লজ্জ চিত্র এবং 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পের অর্থকরী চিন্তার জঘন্য ছবিটি লেখকের বিশিষ্ট প্রবণতার দুটি উল্লেখ্য উদাহরণ। শেষোক্ত গল্পটি মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর যেন-তেন-প্রকারেণ উন্নতিকামনার উপর লেখকের এক সুতীব্র কষাঘাত। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অসংগতি যে লেখকের অনু-ভূতিকে পীড়িত করেছে 'বিচার' গল্পটি তার আরেক প্রমাণ—সরকারী বিচার আর সাধারণ মানুষের বিচারের পার্থক্যই এই গল্পের উপজীব্য।

এই পর্বের প্রায় প্রতিটি গল্পের পটভূমিকাই নাগরিক পরিবেশে সীমায়িত। আমাদের

সামাজিক অসংগতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে লেখকের মধ্যবিত্ত-নাগরিক-চিন্তাই অধিক কার্যকরী হয়েছে। বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির অধোগমন, সমাজের আপাত-আভিজাত্যের তলদেশে বিষাক্ত, ক্লিন্ন আবহাওয়া এবং সামাজিক রীতি-নীতির বেপরোয়া অস্বীকৃতিকে লেখক উদগ্র ও উৎকটরূপে অভিব্যক্ত করেছেন 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পে। স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করলেও সত্যর সংগে সরলার সম্পর্ক তা নয়, একজন জোচ্চোর, আরেকজন পতিতা। 'রূপ বলে সরলার কিছু নেই।' অথচ 'সবাই রূপসী বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসী বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোনো একটা মতামত ঠিক করে ফেলবার অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোন পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভাঁরু পুরুষেরা তাকে ভারী পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যে সব পুরুষের স্বভাব, তারা বড় ভাঁরু।' সরলা ও সত্য—দুজনই পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না, অথচ কেউ কাউকে তাড়াতে পারে না, নীতিবিগর্হিত অপরিত্যাজ্য বন্ধনে তারা আবদ্ধ। 'গুন্ডা' গল্পটির পরিবেশও নাগরিক পাতাল-জীবন, তবে লেখকের সহানুভূতি উন্বেল মন এখানে পুলিশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, গুন্ডার বিরুদ্ধে নয়। শিউ সিং, ম' বুব ও ওসমানের অপরাধে ফেলনাকে গ্রেপ্তার করা নিতান্তই অর্থহীন। অথচ পুলিশ এসে ফেলনাকে গ্রেপ্তার করেছে, যেহেতু সে নামজাদা গুন্ডা, এবং আসামীদের পূর্ব সন্ধ্যায় ফেলনার সাথে যথেষ্ট ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। ফেলনার উকিল শ্যামলাল তাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে আপীল করে ফিরিয়ে এনেছিলো বলেই এটা হয়তো একটা সক্রিয় পুলিশী প্রতিরোধ ব্যবস্থা। পতিতা রাসির সেবা পরায়ণ মূর্তিটি লেখক অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে চিত্রিত করেছেন। কারণে-অকারণে আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা শাসন বিভাগের কুশাসনের জঘন্য নজির এবং বিচার-বিভাগের অবিচারের নগ্ন দৃষ্টান্ত। অথচ যেখানে প্রকৃত শাসনের প্রয়োজন হয়, সেখানে শাসকের নিষ্করুণ ঔদাসীন্য ও বিচারকের বিগতস্পৃহ দার্শনিকতা সুশৃংখল সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। তা না হলে 'বিলামসন' গল্পের নায়ক স্টিফেন এফ বিলামসন জনতার প্রতি যে ধরণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়েছে, তাতে তার কোনো শাস্তি হয় না কেন—এ নিতান্তই এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। অবশ্য এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই, কেননা অর্থনীতিই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সবকিছু; নীতিবোধের মাপকাঠি এবং প্রেম, ন্যায়, নীতি, সত্য ইত্যাদি শব্দগুলোকে অর্থনীতির অক্টোপাসে জড়িয়ে নিতান্ত দার্শনিক বুলির পর্যায়ে পরিণত করানোই একালের বহুস্তম মানবিক ট্র্যাজেডি।

মাণিকবাবুর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের পটভূমি বিগত তিন দশকের নাগরিকের পরিবেশ। কিন্তু শিল্পীর নিপুণ তুলির আঁচড়ে তিনি কয়েকটি গল্পে গ্রামীণ রূপকে অভিব্যক্ত করেছেন। যেমন, 'দুঃশাসনীয়' গল্পটি। এই গল্পে বাংলাদেশের নিঃস্ব পল্লীর বিবস্ত্র নরনারীর নগ্ন ছবিকে তিনি অত্যন্ত নগ্নভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর গ্রাম্য স্বরূপকে উপজীব্য করে লেখা গল্পগুলির মধ্যে সম্ভবত একটিও সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারেনি; কারণ, কোনো একটা বিশেষ মতবাদকে স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে অবলম্বন না করে তিনি সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গল্প লিখতেন না। হয়তো 'হারাণের নাতজামাই' কিংবা 'আজ কাল পরশুর গল্প' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মতবাদের প্রচারধর্মী সৃষ্টি নয় (বলা বাহুল্য, এই গল্প দুটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের পর্যায়ভুক্ত), কিন্তু এই গল্পদ্বয়ে ছোটগল্পের একমুখিনতা (পয়েন্টিং ফিঙ্গার) নেই, এমনকি গল্প লেখকের স্বাভাবিক প্রতিভা বলতে ই. ভি. লুকাশ যা বলেছেন, সেই গল্প বলার স্বাভাবিক প্রতিভাও যেন স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

'পুজো কমিটি' এবং 'যে বাঁচায়' গল্প দুটিকে প্রতিবেদনের পর্যায়ে চিহ্নিত করা চলে।

এই শ্রেণীর গল্পগুলিতে নিছক বিবরণ ছাড়া অন্য কিছুই নেই—এই ধরণের গল্পরচনার সংখ্যাধিক্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষস্থানীয়। মাণিকবাবুর 'কৃপাময় সামন্ত' যেন বিভূতিভূষণের কল্পিত চরিত্র। কারাবাসী পুত্রের শোক এবং প্রায়-বিবস্ত্রা পুত্রবধূর বেদনাবিধুর দৃশ্য তাকে লাউ-চিংড়ি খাওয়ার বাসনা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। 'দুঃশাসনীয়' গল্পের মতো 'রাঘব মালাকর' গল্পটিও পল্লীর দারিদ্র ও দুর্দশার নগ্ন উদ্ঘাটন। অবশ্য রাঘব বিদ্রোহ করেছে, সে অন্যায় সহ্য করেনি, গোতমের চোরাকারবারী ব্যবসায়ে মুটের কাজ করতে করতে গ্রামের প্রায়-বিবস্ত্র নরনারীদের মংগলার্থে একদিন গোতমকে বিপাকে ফেলে কাপড় লুট করে পরিশেষে উপকৃতদের হাতে মাথা ফাটিয়েছে এবং তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করায় তাকে জেলে যেতে হয়েছে।

নগর-জীবনের উপস্থাপনায় এবং গ্রামীণ পরিবেশের পরিকল্পনায় মাণিকবাবু সব্যসাচী। তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক ছিলো না, ফাঁকি ছিলো না উপলব্ধির স্বচ্ছতায়। হয়তো প্রকাশ-রীতিতে কিছু গাফিলতি ছিলো এবং সেই ত্রুটির প্রধান কারণ তাঁর নিজ জীবনের ট্র্যাজেডি। শ্রান্ত মস্তিষ্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করলে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মতো তিনি হয়তো বহু বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গল্পের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু সার আর্থার কোনান ডয়েলের এই উপদেশকে কার্যকরী করার বিন্দুমাত্র প্রবণতাও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিলো না কোনোদিন। তাই প্রায় একই সময়ে তাঁর হাতে প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর গল্প সৃষ্টি হয়েছে। 'সরীসৃপ' ও 'নদীর বিদ্রোহ' গল্পের সৃষ্টিকালের সময় ব্যবধান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

সাহিত্য চিরকালই জীবনানুসারী এবং মানুষের জীবন তার ভালো মন্দয় চিরকালই প্রায় একই সুরে বাঁধা। প্রেম, আন্তরিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা যেমন মানুষের চিরন্তন চিত্তবৃত্তি, ঠিক তেমনি লোভ, হিংসা ও ঘৃণাও আবিকালের ইতিহাস থেকে মানুষের নিত্যসংগী। কিন্তু জীবনের মহৎ দিকের উপাসনায় আমাদের সাহিত্যের উষাকাল থেকে সাধকেরা নিজেদের নিয়োজিত করে এসেছেন, ত্যাগ, বীরত্ব ও প্রেমৈশ্বর্যের সুবিপুল বর্ণনায় আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস ভারাক্রান্ত। নরনারীর চরিত্রের গহন-গোপন প্রদেশের গূঢ় প্রবৃত্তির উদ্ঘাটনে আমাদের সাহিত্যকেরা নিতান্তই নিরুৎসাহিত ছিলেন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-কৃষ্ণের কামজ-লীলা এবং মধ্যযুগীয় মংগলকাব্যের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাস্তবরসাশ্রিত চরিত্র অংকনের খন্ড প্রয়াস এই মন্তব্যের বাইরে পড়ে।

কোন কোন সমালোচক বলেন যে, মানুষের জীবনের অন্ধকার রূপটিকে সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার মৌলিকত্ব আমাদের দেশের কোনো সাহিত্যিকই দাবী করতে পারেন না। জীবনের বামপন্থার (শব্দটি সমালোচকেরা যথতত্র ব্যবহার করছেন) স্বরূপ নির্ধারণে এঁরা পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যিকদের কাছে ঋণী। একথা সর্বথা স্বীকার্য না হলেও আংশিক সত্য। আমাদের কথাসাহিত্যিকের বিশ্বজনীনতা বংকিমের কাল থেকে, যার ক্লাইমেক্স রবীন্দ্রনাথে। উভয়েই পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু বঙ্কিমের হাতে বীরত্ব, ত্যাগ ও প্রেমের যে জয়গাথা রচিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে কখনো বাস্তব ভঙ্গিমায়, কখনো কাব্য-কুহেলি-মন্ডিত আভিব্যঞ্জনায় যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে আমাদের মনের আশা মিটলেও প্রতিনিয়ত চোখে পড়া পরিচিত মানুষ দেখবার প্রত্যাশা সফল হয়নি। এ তুলনায় শরৎচন্দ্র অনেকটা অগ্রসরমান, কিন্তু আরো বাকী ছিলো।

রবীন্দ্রোত্তর কথাকারেরা সে প্রত্যাশা মেটালেন, কারণ এঁদের হাতে সব শ্রেণীর চরিত্রই

জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো, স্খলন-পতন-ত্রুটি নিয়ে অতি-পরিচিতজনের মতো আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। এরা কেউ মহৎ কার্যের সাধনায় বা বিরাট আদর্শের রূপায়নে নিজেদের নিয়োজিত করার প্রবণতায় উন্মুখ নয়, পরন্তু স্বকীয় পদ্ধতিতে স্বীয় দেহমনের ক্ষুধার সামগ্রী জুটিয়ে উঠতেই এরা গলদ্‌ঘর্ম। রাষ্ট্রকে যদি একটি বিরাট মেশিনারী বা যন্ত্রবিশেষ মনে করা যায়, তাহলে এরা তার পার্টস বা অংশবিশেষ। সচেতনভাবে তারা সমাজের কোনো একটা বিশেষ দায়িত্বপালন করে বলে মনে হয় না, তার চেয়ে স্বার্থের সংঘাতে তারা আপন সত্তাকে ভুলে থাকতে ভালবাসে। এই স্বার্থপর, হীনচেতা, কুটিল মানুষের সৃষ্টিই সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের কৃতিত্ব। স্বামী-ভক্তি নারীচরিত্রের মহৎগুণ হিসাবে স্বীকৃত হলেও একালের সাহিত্যিকেরা এই গুণের মধ্যে স্বার্থপরতার ঘৃণ্য রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, নিজের সন্তানের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের জন্য টাকা জমিয়ে প্রতিবেশীর বিপদের দিনে কৃপণতার পরিচয় দেওয়ার হীনমন্যতাকেও এ'রা সাহিত্যে উপজীব্য করেছেন এবং স্নেহের ছদ্মবেশে আত্মজাকে বুকে জড়ানোর উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতার পরিণতিতে পিতার আত্মহত্যার সর্পিল, কুটিল রূপটিও সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের সাহিত্যসামগ্রী। প্রেম ও কামনা, ত্যাগ ও লোভ, দার্শনিক ঔদাসীন্য ও জৈবিক ক্ষুধা—মানব মননের শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ—সাম্প্রতিক-সৃষ্ট সাহিত্যের চরিত্রগুলিতে যেন অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবীন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্যসাহিত্য থেকে এই নতুন রস আমাদের সাহিত্যে সঞ্চারিত করেন নি, একালের পাঠকের রুচি ও রসতৃষ্ণা মূলত পাশ্চাত্ত্য-ভাবানুসারী এবং অতি-সাধারণ পরিবেশ ও জীবনকে উপজীব্য করে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে যখন রস-ভোগবতী বইছে, তখন আমাদের বিশুদ্ধ নৈষ্ঠিক রস-মন্দাকিনীতে অবগাহনের প্রবৃত্তি আর রইলো না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জয়গানে এবং প্রথমচৌধুরীর ফরাসীগল্পের অনুবাদে এই চেতনার পরিপুষ্টি হয়েছিলো, বিকাশ হলো মোহিতলালের দেহাত্মবাদী মনোভংগীতে এবং যতীন্দ্রনাথের অতিবাস্তব বিলাসে, আর কল্লোলীয় বিপ্লবীদের ও তাঁদের সহমর্মীদের হাতে এই বোধের অভিব্যক্তি ঘটলো।

ঠিক এই সময়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে এসেছিলেন। তবে তারাশংকর যেমন রাঢ়ীয় উৎকট আতিশয্যে মানুষের জৈব রূপটিকে ফুটিয়ে তুললেও তার অন্তস্তলে সাহিত্যিকের মহৎ দায়িত্ব পালন করে চলেন অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসনায় তাঁর বিশিষ্ট মর্জিকে নিয়োজিত রাখেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন জগৎ ও জীবনের ওপর এক নির্বিকল্পাত্মক দৃষ্টিভংগীর সাহায্যে প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় রহস্যলীলায় বিভোর হয়ে থাকতেন, মাণিকবাবুর রুচি ছিল ঠিক তার বিপরীত। সত্যিই ভাবতে বড়োই বিস্ময় লাগে যে বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুই বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারী একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিতিক প্রায় একই সংগে বাংলাসাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের অবিশ্রান্ত লেখনী বন্ধ হয়েছে প্রায় একই সংগে, উভয়েই প্রায় একই সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন, দুয়েকটি অনুল্লেখ্য নমুনা ছাড়া প্রায় একই আংগিকে অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাঁদের সাহিত্যভাবনাকে দুর্মর স্থায়িত্ব দান করেছেন,. উভয়েরই জীবনের প্রথম পর্বের রচনাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, দুজনেই অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেন নি— অথচ এত মিল সত্বেও এই দুজনের বৈসাদৃশ্য আকাশ-পাতাল। এই উপমাটি বোধ হয় এ'দের পরস্পরের তুলনায় একমাত্র সুপ্রযুক্ত উপমা। কেননা সমসাময়িক দুই সাহিত্যিকের মধ্যে বিভূতিভূষণ কোনোদিন পাতাল-রহস্যের অনুসন্ধানে অনুপ্রবিষ্ট হন নি, মাণিকবাবুও নভোচারী কল্পনায় ঔৎসুক্য দেখান নি। বিভূতিবাবুকে যদি ইছামতীর সংগে তুলনা করা যায়, তাহলে মাণিকবাবুর তুলনা পদ্মা। তিনি নিজে পদ্মার মতো প্রাণোচ্ছল

ছিলেন, তার সৃষ্টির চরিত্রগুলিও পদ্মার মতোই রহস্যময়,—পদ্মার এই স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতীক।

বাংলাসাহিত্যে বিকৃত মনস্তত্ত্ব ও যৌনতত্ত্বের উপস্থাপনায় এই সাহিত্যিক স্মরণীয়তম। প্রায় শতাধিক গল্পের উপজীব্য মানবমনের কমপ্লেক্স, যা হঠাৎ চোখে পড়ে না, জীবনের উপরিভাগে যা ভাসমান নয়, যা মানবমনের অবচেতনে লুক্কায়িত। তাঁর 'বৌ' পর্যায়ের অধিকাংশ গল্পগুলিই স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য এবং পরিণামে স্ত্রীর মানসিক বিকারজনিত উদ্ভট ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির লক্ষণ। অবশ্য 'অতসীমামী'র প্রেমনিষ্ঠা অথবা 'বৃহত্তর-মহত্তর' গল্পের মমতার তাত্ত্বিক সংলাপের সমাপ্তিতে স্বামীর কুশলসংবাদ নেওয়ার মধ্যে 'মায়া'র উদ্ভব অথবা 'স্বামী স্ত্রী'র দাম্পত্যচিত্রের মধুর ব্যঞ্জনার কথা বাদ দিলে মাণিকবাবুর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কিছুটা রহস্যমূলক; যৌনাবেগের উৎকট আধিক্য কোথাও কোথাও মনোবিকারে পর্যবসিত। অবশ্য 'বৃহত্তর-মহত্তর' গল্পের দাম্পত্যচিত্রও সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়; এই গল্পের নায়িকা মমতা যেন একটা থিয়োরীর প্রতীক। মোটামুটিভাবে মাণিকবাবুর প্রায় প্রত্যেকটি বিখ্যাত নারীচরিত্রের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি এই চরিত্রটির বোধ ও বুদ্ধির সংগে একীভূত। বিক্ষিপ্তভাবে মমতার কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে দেওয়া হলো ঃ

ঃ আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন। শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনী হলে অভাগিনী হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় করে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতে যে-জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব তার সমস্ত গ্রাস না করত, আমি মুখ বুজে তার সংসার ঘাড়ে করে মরতাম, সুখশান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার, অনিদ্রা, প্রহার, নির্যাতন, উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি। জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না।

ঃ কর্তব্য মানে? স্বামী-সেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্য্যা?

ঃ স্বামী আমার কাছে ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়,—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে আসা আত্মার দূরত্ব বেশী। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণে বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই?

ঃ বড় ছেলের বয়স বার— মনের বিকৃতিতে বার শ। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগী, বোকা, অলস। ছোটটিও ওমনি ভাবে গড়ে উঠবে— দুজনেই একদিন বাপের মতো হবে।

ঃ অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পয়সা দিয়ে কেনা দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায়, দুর্ভাগ্য; শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কতবড় অন্যায়, কতবড় দুর্ভাগ্য?

বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উধৃতি দিয়ে মাণিক-সৃষ্ট নারী চরিত্রের মূল স্বরূপকে দেখানো হলো। বিবাহিতা মেয়েদের সমস্যার অতিবাস্তব চিত্রের পরিস্ফুটনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকত্ব প্রধানতম হিসেবে স্বীকৃত। "কেরাণী'র বৌ"-এর সরসীর মনোবিকার 'সাহিত্যিকের বৌ'-এ সূর্যকান্তের আবেগের অসহ্য উন্মাদনায় অমলার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ, 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'-এ মহাশ্বেতার প্রতি যতীনের বিকৃত সন্দেহ, 'পূজারীর বৌ'-এ সন্তানকামনায় কাদম্বিনীর আকুতি, মূর্ছারোগ ও আত্মহত্যা,'রাজার বৌ'-এ ভূপতি ও যামিনীর রহস্যময় সম্পর্ক, 'উদারচরিতানামের বৌ'-এ যতীনের নিষ্ক্রিয় প্রণয়ে স্ত্রী শতদলবাসিনীর চিত্তবিক্ষোভ, 'সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ'-এ স্বামী নিবারণের বিশ্বপাণ্ডিত্যে প্রেমলোভাতুরা পত্নী সুনয়নীর ক্ষোভ ও উন্নাসিকতা, 'সর্পিল'

গল্পে শংকর কেতকীর রিক্ত সম্পর্ক ("যে রাজ্যে শুধু বালি ধু ধু করছে, তার অধিকার নিয়ে মেয়েমানুষ মারামারি করে না")'আততায়ী' গল্পে কৃত্তিবাসকে পরিত্যাগ করে দিবাকরের সংগে বৌ-এর গৃহত্যাগ, 'সাধুতে বড় বৌ সুমতির সংগে স্বামী কৃষ্ণাপদানন্দের সম্পর্ক ও অন্যায় আসংগ-লিপ্সা, 'ভয়ংকর'-এ ভূষণের স্ত্রী আশার সংগে প্রসাদের দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়াস; 'রোমান্স'-এ নটবরের স্ত্রী সুখময়ীর গ্রামের মোক্তার সুবলের সংগে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া, 'মৃতজনে দেহ প্রাণ' গল্পে ভূপতির স্ত্রী প্রমীলার পরাশরের সংগে সহবাস, 'মহাজনে' বিধুশেখর ও বাংগার হৃদয়হীন প্রণয়লীলা, 'মমতাদি' গল্পের মমতার সংগে তার স্বামীর রহস্যমূলক প্রেম, "মহাকালের জটার জট'-এ মনোরমার মনোবিকার, 'মহাবীর ও অচলার ইতিকথা'য় মহাবীরের প্রতি অচলার বিরক্তি ইত্যাদি ঘটনায় মাণিকবাবুর দাম্পত্য-চিত্রের কয়েকটি অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট-গোচর। কোথাও দৈহিক অসংগতি, কোথাও মানসিক ব্যাধি, কোথাও অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, কোথাও বা প্রাক বিবাহিত জীবনের প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর আবির্ভাব, কোথাও বা স্বামীর অনুপস্থিতি বা জৈবিক আনন্দে নিরাসক্তিই এই চরিত্রগুলির মধ্যে ভাঙ্গন বা বিপর্যয় এনেছে। অবশ্য যৌনাবেগই সাধারণত এদের মনোবিকারের মুখ্যতম কারণ। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহিতা নারীদের অন্যাসক্তিকে অতি তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং পরপুরুষাসক্তা নারীর স্থান নরকে—একথা শাস্ত্রকারেরা বলেছেন। সম্ভবত এই মন্তব্যই আমাদের দেশের মেয়েদের মনের অবচেতনায় স্বামীকে এমন একটা আইডিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করে যাকে দেহমনে একান্তই স্বী-করণ আবশ্যক। তাই, স্বামীর সংগে মেয়েদের মানসিক ও দৈহিক মিলন না হলে প্রায় ক্ষেত্রেই তা মনোবিকারের লক্ষণে স্পষ্টীকৃত হয়ে ওঠে।

শুধু বিবাহিতদের সম্পর্কেই নয়, অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের যৌন-রুচি সম্পর্কেও লেখক বহু গল্প লিখেছেন। 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'সরীসৃপ', 'হলুদ পোড়া', 'ট্রাজেডির পর' 'মুখে ভাত', 'মেয়ে', 'দিশেহারা হরিণী', 'মহাকালের জটার জটে', 'প্যাঁক', 'হাত', ইত্যাদি গল্পে অবরুদ্ধ কামনার নীতি বিগর্হিত প্রকাশভংগী পাঠকের চৈতন্যে আঘাত করে। মাণিক বাবুর প্রায় দু'শো গল্পের ভাণ্ডার থেকে কয়েকটি অতিমাত্রায় বিশেষিত গল্পের আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে করা গেল। আংগিকের দিক থেকে 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'হলুদ পোড়া' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ছাড়া প্রায় অধিকাংশ গল্পই নিছক প্রতিবেদন মাত্র, তাতে না আছে সাসপেন্স, না আছে ক্লাইমেক্স এমন কি ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রুডিয়ার্ড কিপলিঙ যে 'চোরা লণ্ঠনের আলোর' কথা বলেছেন, যার ফলে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে' চিত্ত ঝলমল করে উঠবে, তারও প্রায় কোনো লক্ষণীয় পরিচয় নেই এখানে। তবে উপস্থাপনা-রীতির কথা বাদ দিলে উপজীব্যের দিক থেকে তিনি বলতে পারেন

"আমি মনে করি
যৌবনের, বিদ্রোহের, জীবনের অন্ধ আনন্দের —
কিংবা তার অস্থির স্মৃতির— যদিও করেছি স্তব
তৃপ্তিহীন, স্তাবকতা কখনো করিনি। আমার পূজায়
পৌত্তলিক কামনা ছিলো না। রূপে রঙে বানায়েছি প্রতিমারে
প্রাণে ছন্দ ছিলো বলে।" (মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে —বুদ্ধদেব বসু)

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

জাহাজের যাত্রী

চলতি জাহাজ ডাঙার ও জলের কিনারার ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়ে দিতে, বন্দরের পাড় ঘেঁষা ইমারতগুলির সীমারেখার তরঙ্গভঙ্গ আস্তে আস্তে দ্রবীভূত হয়ে একজোট হয়ে গেল। সন্ধ্যার ল্যাপিজ ল্যাজুলী রঙে খোলা আকাশ ও জলের বিস্তৃত পটভূমির মাঝখানে স্থলের অপসৃয়মান অস্তিত্বকে জানাচ্ছিল প্রায় মুছে যাওয়া একটা গাঢ় ব্যদামী লম্বা ছাপ যার থেকে গোলাপী, নীল, লাল ও হলুদ রঙের আলোর ফোটাগুলি ঝিকমিক করছিল। জাহাজের পশ্চাতে প্রপেলার এ উদ্বেলিত মসৃণ জলরেখাকে অনুসরণ করে, কাকলীতে আকাশ কাঁপিয়ে পিছু ধাওয়া করছিল এক ঝাঁক গালপাখী। অনেকেই ডেক-এ রেলিং-এ ভরদিয়ে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দেখছিল দূরের জমি, যেখানে জমা হয়েছে ভরা সন্ধ্যার কুয়াসার মত বিপদের ঘন কুজ্ঝটিকা। কিন্তু কারুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না যে তারা বিপদকে এড়িয়ে যাচ্ছে বলে স্বস্তি পেয়েছে। ইয়োরোপের মানচিত্রকে অতিক্রম করে যতক্ষণ আমাদের জাহাজ নিরাপদ এলাকায় না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ বিপদের ভাবনা কারুর মন থেকে যাবে না। সকলেরই অবস্থা যেন "জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ" এর মত সমস্যায় ভরা।

দিন দুয়েকের মধ্যে যাত্রীদের গন্তব্যস্থান, জাতিকুল ও পেশা সম্বন্ধে সকলের বেশ একটা জানাজানি হয়ে গেল। প্রায় দু' হাজার ফরাসী সৈন্য চলেছে সাইগন-এ, কারণ ফরাসী সরকারের আশঙ্কা যে ইয়োরোপে লাগা যুদ্ধের আগুণ এসব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সে সম্ভাবনার জন্যে তাঁরা তৈরী থাকতে চান। শ' দুয়েক চীনা ছাত্রছাত্রী ইয়োরোপের নানান্ বিদ্যাকেন্দ্রে পড়াশুনা শেষ করে ফিরছেন স্বদেশে। দু'তিন জন ফরাসী মহিলা পিত্রালয়ে ছুটি কাটিয়ে চলেছেন প্রাচ্যদেশীয় স্বামীর কাছে। জাহাজে নাবিক ও কর্মচারী ছাড়া যাত্রী ছিল ডজন খানেক এক বিশেষ পেশার নারী।

ফরাসী জাতি তার দৈনন্দিন জীবনে পর্যন্ত লজিক মেনে চলে। তাই এই অভিযানকারী যোদ্ধাদের সময়ে সময়ে বিশেষ দৈহিক প্রয়োজনের খোরাক মিটাবার জন্য রসদ হিসাবে চলেছেন এই মহিলাগুলি। প্রত্যহ এ'দের বেলা বারোটার পর দেখা যেত বার-এ বসে রাতের কারবারে ক্লান্ত দেহকে কারণবারি সেবনে আগামী রাতের ডিউটির জন্য আবার চাঙ্গা করে নিচ্ছেন।

সামাজিক নিয়মাবদ্ধ মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহে নেমে সমাজনীতি ও ব্যবহারের সংযমমুক্ত হয়ে আদিম প্রবৃত্তি ও খেয়ালের ঘোড়ার লাগাম দু'হাতে খুলে ছুটিয়ে দেয়। এর জন্যে কৈফিয়ৎ তারা দিতে রাজী নয়। সকলের বোঝা উচিত যে তাদের জীবনের মেয়াদের আর কোন স্থিরতা নেই তাই তারা বেঁচে থাকার সবমুহূর্তের কোনটাই যাতে সুখামোদের বাইরে ফাঁকিতে না পড়ে যায় তার জন্য অতিশয় ব্যগ্র ও ব্যস্ত। ফরাসী সরকার চায় না যে তার যোদ্ধারা সুখানন্দ কুড়াতে অজানা অচেনা ও বিদেশী কোন বারাঙ্গনার সংস্পর্শে এসে প্রেম বিহারের কোন দুর্বল মুহূর্তে সামরিক গোপন সন্ধান প্রকাশ করে দিয়ে ফেলে। কে বলতে পারে যে এদের কেউ শত্রুর নিযুক্ত গুপ্তচর নয়। তাই সৈন্যদের জন্য এই সদা ক্ষণিকের প্রণয়িনীদের সরকার থেকে দেশজাদের থেকে পরখ করে বেছে নেওয়া হয়েছে।

বোধহয় সামরিক খবরাখবর বিদেশীদের কাছে গুপ্ত রাখার উদ্দেশে সাবধানী কানুন বজায় রাখতে সৈন্য ও জাহাজের কর্মচারীরা অন্যান্য যাত্রীদের তফাতে রেখেছিল। আমি ছিলাম একমাত্র ভারতীয় যাত্রী এবং অতি সহজে চীনা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। এদের প্রায় সকলেই ইয়োরোপে পড়াশুনায় বছর তিন চার কাটিয়েছেন। এখন পারদর্শী হয়ে ফিরছেন দেশ-সেবার দৃঢ় সংকল্প মনে নিয়ে। চীনারা স্বভাবত চাপা প্রকৃতির, কাজেই একেবারে মন খুলে সব কথা তারা বলতনা। ভাসা ভাসা কথোপকথনে জেনেছিলাম যে তারা মনে করে না, জাপানকে চীন দেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে চীনের রাষ্ট্রভার নিতে বাগ্র যে সকল নেতাদের উদ্ভব হয়েছে তাদের স্বপক্ষ দলে রয়ে গিয়েছে বহু খাঁটি ও রন্দি কর্মীরা। কিন্তু অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার জালে পড়ায় তাঁদের তলিয়ে দেখবার সময় নেই কে উপযুক্ত বা কে অনুপযুক্ত। জিকুইডেসন এর সহজ প্রণালী অব-লম্বনে প্রত্যেক রাজনৈতিক শক্তি সন্দেহভাজন মনে হলেই নাগাল পাওয়া নাগরিক ও কর্মীদের নিপাত করে চলেছেন। অথচ সমাজের একই প্যার্টান এর লোককে নিয়ে তৈরী হয়েছে বেশীর-ভাগে এই শক্তিগুলি কেবল নামেই তারা বিভিন্ন। একই ডেকাডেন্সএর ডোবায় পড়ে তারা একে অন্যের উপর পাঁক ছিটিয়ে বলছে এরা নোংরা লোক। এই ছাত্রছাত্রীদের দেশসেবার সংকল্পে কোন খাদ না থাকলেও এদের অনেকেই হয়ত রাজনৈতিক চক্রে পড়ে অযথা প্রাণ হারাবে। কিন্তু সে পরিণাম ভেবেও তাদের একজনও চিন্তিত বা ভীত নয় দেখলাম। তাদের একপণ চীনকে পতনের পিছিল পথ থেকে উঠিয়ে উন্নতির সোজা ও শুখনো পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে এবং সে রাস্তা সমান করতে যত অসংখ্য দেহের প্রয়ো-জন তার সরবরাহের জন্য তারা সকলেই প্রস্তুত। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা তারা কিছুটা শুনেছে কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হলেও দেখলাম, আমাদের দেশসম্বন্ধে যেটুকু জানা উচিত তা তারা জানে না বা তা জানবার আগ্রহও নেই। আমাদের দেশবাসীরও চীন সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা ঐ একই ধরণের। আজকাল "হিন্দি চীনী ভাই ভাই"-এর চিৎকার শোনা যায় দিকে দিকে। কিন্তু আমরা খবর রাখি মাদাম পম্পাদুর ও পণ্ডদশ লুই এর কামরার মধ্যে ব্যবধান ছিল কতগজ অথবা নাপোলেয়ঁ লড়াই এর মাঝে ক'বার স্নান আর ডলাই মলাই করতেন কিংবা চেম্বার-লেন মিউনিক এর কনফারেন্সএ ক'বার হাই চেপেছিলেন। চীনের ইতিহাস ও কাহিনী পড়ার ও জানার সময় আমরা এখনও করে উঠতে পারি নি। এক কিংবদন্তীর জোরে আমরা ধরে নিয়েছি যে চীনে আর ভারতের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল থেকে খুব দহরম-মহরম বন্ধুত্ব, তাকে আবার খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হলেও চীনের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক-ভাবে উল্লেখযোগ্য এমন কোন সাক্ষাৎ রাজনৈতিক যোগাযোগ হয়নি যার ফলে বলা যেতে পারে যে এই দুই দেশের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন মিত্রতা কোনসময়ে গড়ে উঠেছিল। যেহেতু অতীতে চীন ও ভারতের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি অতএব মিত্রতা ছিল এমন প্রমাণে সত্যের অপলাপ করা হবে। সাধারণ ধারণায় যেমন ভারতকে সমগ্রভাবে একটি দেশ বলে ধরা হয় যদিচ এক সাধারণ কৃষ্টিগত সংযোগ ছাড়া জাতি ও রাষ্ট্রগতভাবে একদেশ ছিলনা। ১৯০৭ এরা আগে মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, সিংকিয়াঙ্গ ও তিব্বত শুধু রাজ্য শাসনে নয় জাতিগতভাবে আচারে ও ব্যবহারে ছিল চীনের অন্য অঞ্চল থেকে বিভিন্ন। সিংকিয়াঙ্গ (অর্থাৎ নূতন উপনি-বেশ) কাশ্মির ও তিব্বতের মাঝামাঝি জায়গাগুলিতে এবং প্রাচ্য তুর্কিস্থানে খুলজা, কাশগারিয়া ও তাতার প্রভৃতি ভিন্ন জাতিদের রপ্তানিকরা চীনা প্রভুরা শাসন করেছিলেন বহুকাল। বিশুদ্ধ চীনাদের দেশ বিংশশতাব্দির আগে চীনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র স্থানে নিবদ্ধ ছিল। তিব্বতের

অংশ সাধারণভাবে চীনের অন্তর্ভুক্ত হলেও লাসার শাসন ছিল প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাজ-নৈতিক কারণে প্রায় দু শতাব্দি যাবৎ ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে চীন অপেক্ষা নিকট সম্পর্ক রেখে-ছিল। কেবল ভৌগলিক পরিবেশে সমগ্র চীন অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিশেষকরে পশ্চিমের দেশ সমূহের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকায় এর সভ্যতা গড়ে উঠেছে অবিমিশ্র একবিংশতি ধারায়। সেই অতিবিশিষ্ট অপরিবর্তনশীল সভ্যতার ভিত্তি ছিল এত গভীর যে উনবিংশ শতাব্দি থেকে ইয়োরোপীয়দের অভিযানে ও উপনিবেশকারিদের আওতায় পড়েও তার গায়ে পরিবর্তনের কোন ছাপ লাগেনি। বিংশ শতাব্দিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং বিজ্ঞানের অগ্র-গতিতে পূর্বের ভৌগলিক স্বাতন্ত্র ভেঙ্গে যাওয়ায় নানান দেশের চিন্তাধারা ও সভ্যতা দ্রুত-গতিতে আমূল পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়েছে। মূলত ভৌগলিক অবস্থিতির কারণে চীনারা আপন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে বাইরে পা দেবার বিশেষ সুবিধা পাই নি। কিন্তু সামান্য কয়েকবার যখন সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল চীনা সামরিক শক্তি নির্মমভাবে অন্যের এলাকা আক্রমণ করেছিল। সপ্তম শতাব্দিতে টাঙ্গ বংশীয় সম্রাটদের প্রবল সেনা বাহিনী দিকে দিকে অভিযান করে কোরিয়া, তুর্কিস্থান, উত্তর পশ্চিম ভারতও তিব্বতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দিতে মিং সম্রাট ইউংগ্লো, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁর বিজয়ী সৈন্যরা যবদ্বীপ ও সিংহলে হানা দিয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত পাড়ি দেয়। তদানিন্তন সিংহলরাজের এক পুত্রকে চীনে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মিং সম্রাট বহু বৎসর ধরে সিংহলের কাছ থেকে কর আদায় করেছিলেন। এছাড়া চীন মহাদেশের মধ্যে শতাব্দির পর শতাব্দি যে সংগ্রাম ও রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে তার ছিটে ফোঁটা বাইরে কোথাও পড়েনি বলে আমরা ধরে নিয়েছি চীনারা অতিশয় শান্তিপ্রিয় জাতি। এসব লিখে আমি অবশ্য প্রমাণের চেষ্টা করছিনা যে জগতের মধ্যে চীনারা অতিশয় হিংস্র বা যুদ্ধ পরায়ণ জাতি, এও আমার উদ্দেশ্য নয় যে ভারত ও চীনের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপনের অন্তরায় হবার মত কিছু বিষয়ের বিজ্ঞাপনী দেওয়া। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ভিত্তি তখনই হয় স্থায়ী ও দীর্ঘায়ু যখন তাদের ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে সর্বাঙ্গীন ভাবে জানা ও উপলব্ধি করা যায়। চীন ও ভারতের সম্পর্কের একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু এই ধর্মকে উপলক্ষ করে কিছু ধর্মপণ্ডিত ও পরিব্রাজকদের গমনাগমন ও ভারতের ধর্মপুস্তক ও পূজার্চনার মূর্ত্তি চীনে রপ্তানী হওয়ায় এই দুই দেশের শাসক কুল বা জনগণের সঙ্গে কোন কালে কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেনি। এই প্রসঙ্গে এটাও জানা প্রয়োজন যে চীনে বহুবিধ ধর্মের প্রচলনে কোনদিন তার কোনটির প্রতি তদ্দেশীয়দের প্রগাঢ় আসক্তি বা গোড়ামীর সূত্রপাত হয়নি যেমন ভারতে বহুবার ধর্মমত ও তার আবেগ জাতির ভিত্তিকে নাড়া দিয়ে প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন ও প্রচণ্ড আক্ষেপের সূচনা করেছিল। চীনাদের অতি প্রাচীন প্রথা পূর্বপুরুষদের অর্চ্চনা সকল ধর্মমতকে ছাপিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে চিরকাল। একটা জাতির স্বভাবধর্ম শুধু দু'একটা ভেসে আসা দার্শনিক ধারণা বা পূজা আরাধনার মাধ্যমে তৈরী হয় না।

পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণপূর্ব চীনের জলে ও ফসলেভরা দেশগুলির উপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাত উত্তর ও পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুভূমি ও পাহাড়ের দুর্দ্ধর্ষ বাসিন্দারা। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি বা বন্যার ফলে দুর্বার জীবন সমস্যায় পড়ত সুজলা সুফলা জমির অধিবাসীরা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় চীনের বাসিন্দাদের একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল আটকে রাখতে পারে নি। ঐ মহা-ভূখণ্ডের মধ্যে সময়ের গালিচায় ঘটনাচক্রে স্থান ও গৃহপরিবর্তনে ধাবমান চীনা গোষ্ঠীর পদ-ক্ষেপ তৈরী করেছে এক জটিল নকসা। বিশেষ মাটি, জল ও সারানিরপেক্ষ উদ্ভিদ যেমন যে কোন

স্থানে ও যে কোন আবহাওয়ায় বেঁচে বর্দ্ধিত হয় তেমনি ভিটেমাটির আকর্ষণ বিহীন চীনারা কোন ভূখণ্ড বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট মন না হওয়ায় পৃথিবীর যে কোন দেশে ও স্থানে এবং অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোন পরিবেশে সহজে বাসা বেঁধে ফেলতে সমর্থ।

চীনদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে সমষ্টিগত জীবনের প্রাধান্য অনেক বেশী। জমি জমা সম্পত্তি ও ফসল সবই সপাপরিবর্দ্ধনশীল পরিবারের সম্মিলিত অধিকারে থাকত এবং বহুত্তর ভাবে সারা গ্রামের বিষয় আসয় সকলের সমবায় অধিকারে ন্যস্ত ছিল। এর তত্ত্বাবধান করত গ্রামের মুখ্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ অধিবাসীগণ। সমবায় সমাজজীবনের আদর্শ রাশিয়ায় বহু চেষ্টা ও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার সাহায্যে আজও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি অথচ সে তুলনায় অনুন্নত চীনে বর্তমানে তার পুরোপুরি সাফল্য দেখে জগতের জনগণ আজ বিস্মিত। কিন্তু এই সমবায় সমাজের প্যাটার্ন চীনে দু'হাজার বছর ধরে বিদ্যমান কাজেই আজকের সমাজজীবনে এটা অভিনব রূপান্তর নয় একটা নামান্তর মাত্র।

ধর্মের প্রতি দৃঢ় আসক্তি ও গোঁড়ামী না থাকলেও তিনটি ধর্মমত চীনাজীবনকে অতিপ্রাচীন কাল থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রাচীনতম ধর্ম তাও ইজম ও কনফুসিয়ানিজম-এ পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবনার চেয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবয়ব গঠনাদর্শ এবং তার সুষ্ঠু পরিচালনায় ধারণা ও আলোচনার প্রাধান্য ছিল বেশী। কনফুসিয়াস-এর ধর্ম ছিল রাজধানী ও নাগরিককে কেন্দ্র করে আর তাওইজম ছিল প্রধানত গ্রাম, চাষাভুষো ও সাধারণ লোকের ধর্ম। হান্ বংশীয় সম্রাটদের অভ্যুদয়ের আগেই চীনে সামন্ততন্ত্র লোপ পেয়ে যায় এবং রাজের শাসনভার দেওয়া হোত উচ্চ বংশীয় বিদগ্ধজনদের উপর। পরবর্তীকালে শাসনকর্মের নায়কদের নির্বাচন করা হোত পরীক্ষার দ্বারা। এই রীতির প্রচলনে চীনের ধৈর্য্য ও প্রশ্নের সুদূর অঞ্চলের গুণীজনরাও রাষ্ট্রে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেতেন। কনফুসিয়াস ছিলেন এমনি এক অতি বিখ্যাত বিদগ্ধজন। অতি অল্প বয়সে নানা বিদ্যায় পারদর্শীতা ও যশ লাভ করায় তিনি দেশ শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার উপদেশের মর্ম ছিল যে বিদ্যার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন ও রাজ্যে ও সমাজে প্রত্যেকের আদর্শ সম্পর্ককে উপযুক্ত আদব কায়দায় বজায় রাখা। কনফুসিয়াস-এর জীবন সংক্রান্ত নানা কথিকার থেকে তাঁর ধর্মমতের স্বরূপকে দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। শোনা যায় যে একবার তিনি অন্য প্রদেশ থেকে প্রাচীন পুস্তক পাঠ ও গবেষণা করে আপন এলাকায় ফিরে দেখেন যে তাঁর অবর্তমানে জনগণ বিদ্রোহ করে তাদের রাজ্যাধিনায়ককে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। কনফুসিয়াস প্রজাদের শাসকের প্রতি এই অশিষ্টাচারকে ঘোরতর অধর্ম ঘোষণা করে রাজ্যাধিনায়কের দশার অংশভাগি হ'তে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান। একদিকে যেমন তিনি প্রজাদের শাসনকর্তার প্রতি অমর্যদা প্রকাশকে ক্ষমা করেননি অনুপযুক্ত ও নিপীড়ক শাসকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল তেমনি তীব্র। গল্প আছে যে স্বেচ্ছানির্বাসন যাবার পথে এক নির্জন পার্বত্যময় স্থানে দেখেন যে এককিনী রোরুদ্যমানা এক রমণী মৃতের সমাধির উপর অবলুণ্ঠিতা হয়ে আর্তনাদ করছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল যে মহিলাটির পতির পিতা, পতি ও একমাত্র পুত্র ঐ স্থানে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন। সেখানে একা অধিকক্ষণ থাকলে তাঁকেও যে বাঘ নিপাত করতে পারে বলায় মহিলাটি বল্লেন যে রাজের শাসক অবিচারী ও উৎপীড়ক হওয়ায় তাঁর গৃহের চেয়ে বিপদসঙ্কুল হলেও বনের আশ্রয় শ্রেয়। কনফুসিয়াস তাঁর সহগামী শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করে বল্লেন "দেখহে এই দৃষ্টান্তে প্রমাণ হচ্ছে যে শাসক অবিচারী ও নিপীড়ক হলে বাঘাপেক্ষা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।"

কনফুসিয়াস এর সমসাময়িক কিন্তু বয়েসে অনেক বড় লাওৎসে ছিলেন তাওইজমের জনক। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী লাওৎসে ভূমিষ্ঠ হবার আগে জননীর জঠরে ছিলেন আশী বৎসর তাই জন্মেছিলেন একেবারে পক্বকেশ দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধরূপে। তাও ধর্মে মিতাহার, মিতাচার, অমানুষিক ক্ষমতা অর্জন, দীর্ঘায়ু হওয়া, ইন্দ্রজাল, ও এ্যালকেমী প্রভৃতি জড়িত থাকায় কনফুসিয়ানিসম্-এর চেয়ে এর জনপ্রিয়তা বেশী ছিল। এই ধর্ম্মমতে কনফুসিয়ানদের সমর্থিত বেশী বিদ্যাশিক্ষায় মানুষের সরল স্বভাব নষ্ট হবার খুবই সম্ভবনা মনে করা হোত। রাজনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তাও ধর্ম্মাবলম্বীরা সরকারের কেন্দ্রিভূত ক্ষমতার আধিক্যকে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা গণ স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের আওতায় অনেক ছোট ছোট গ্রাম প্রায় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতালাভ করেছিল। সরকারের সৈন্যবল সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ এবং আইন কানুনের ব্যবহারের প্রতি ছিল তাঁদের বিশেষ বিরাগ। কনফুসিয়ানিজম ও তাওইজমের বিরোধী মতবাদে চীনের সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল তাকে মিটিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল আমদানী বৌদ্ধ ধর্ম্ম। হান্ সম্রাটের বিজয়ী সৈন্যদল ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের সংস্পর্শে আসায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে এসে পড়ে সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম। বিশুদ্ধ চীনাদের চেয়ে তুর্কী ও মোঙ্গল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মোঙ্গল সম্রাট কুবলাউখানএর আমলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রসিদ্ধি পাওয়ায় সেখান থেকে ভিক্ষুদের চীনারাজদরবারে যাবার আমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু তাও ধর্ম্মের মত বৌদ্ধধর্ম্মের আমদানী রূপে মিশে গিয়েছিল নানা জনপ্রিয় তন্ত্রমন্ত্র ইন্দ্রজাল ও নানা অমানুষিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য হটযোগ। ফলে তাওএর ধর্ম্মাবতারা বৌদ্ধদেবদেবীর নাম নিয়ে তার মধ্যে ভিড়ে যাওয়ায় চীনের বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের গমনাগমনে এ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের যে দোহাই দেওয়া চলে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে। পরে ভারতীয় দু'একজন ভিক্ষু যাঁরা তিব্বত থেকে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের মারফত এ দুই দেশে আর কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি।

আ লো চ না

চ্যালেঞ্জ

হিমালয়ের চো ওয়ুশৃঙ্গে আরোহণ অভিযাত্রী নারীদলে এবার যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো, তা নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ব্যঙ্গাত্মক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্রলেখকের মূল বক্তব্য হল, কি দরকার বাবা মেয়েছেলের এমন যে'ড়োমি করবার।

দরকার সত্যিই হয়তো নেই, দুরারোহ পর্বতচূড়ায় ওঠার কোন বাস্তব সার্থকতা আন্তর্জাতিক তুহিন যুদ্ধের (কোল্ড ওয়ার) পরিপ্রেক্ষিতে যদি বা থাকে, একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না যে অভিযাত্রীদলগুলি সোভিয়েট বা আমেরিকার পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বা ঘাঁটি সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ প্রচেষ্টা করে থাকে। তবে সেই অভিযানের নিরর্থকতা কি পুরুষ কি নারী উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু কেউ যা করেনি বা করতে পারেনা, তা করতে যাওয়াটাই একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ, আর সেই করাটা যত আয়াসসাধ্য, চ্যালেঞ্জের জোরও তত বেশী। এই চ্যালেঞ্জ, অজেয়কে জয় করবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবের অংশবিশেষ। প্রকৃতিই শ্রেয়কে করেছে দুর্মূল্য, দুঃসহ করেছে বীরের জীবনকে।

নারী দৈহিক শক্তিতে পুরুষের চেয়ে উন, কিন্তু তার সহনশীলতা কম, এমনকি দৈহিক শক্তির ব্যাপারে, তা কোনমতেই প্রমাণ করা যায়না। অধিকাংশ দুঃসাধ্য অভিযানে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের চেয়ে সহনশীলতার এবং মনোবলেরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। স্নিগ্ধ শান্ত সহজ জীবনের মায়া কাটিয়ে দুর্জয়ের ডাকে সাড়া দেবার প্রবণতা আজ যদি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনেও আলোড়ন তুলে থাকে, তো তার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অবজ্ঞার কি আছে! যারা ঝানু মহিলা পাইলট দুর্বা ব্যানার্জিকে সরকারী চাকরী দিচ্ছেন না, নারীর স্বভাবজ দৈহিক দুর্বলতার ওজুহাতে, তাঁদের মনে রাখা দরকার বিমান চালনা রোলার টানা নয়, সেখানে দরকার সূক্ষ্মকৌশল ও দৃঢ় মনোবল।

এই চ্যালেঞ্জের প্রবৃত্তিটি বিশ্লেষণ করলেই তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবো। যেখানে ৭৩১ পাউণ্ডের বেশী ওজন আজ পর্যন্ত কেউ তুলতে পারেনি, সেখানে কেউ হঠাৎ ৭৩১½ পাউণ্ড তুলে ফেললেই তার দুটো হাত বেশী গজাবে না, কিংবা সে বেশী ওস্তাদ বলে প্রতিভাত হবে না। তবু নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্বে সে সর্বত্র খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাবে। এটাকে কিন্তু আসলে যুগের বোকামি বলে মনে করাটা ভুল হবে।

আর সবার যা শেষসীমা, সারা বাঙলায়, সারা ভারতে কি সারা দুনিয়ায় যতদূর সবাই পে'ৗচেছে সেই সীমা সামান্যর জন্য হলেও আমি ভাঙবো এই আমার চ্যালেঞ্জ। যেই ভাঙলাম নতুন রেকর্ড হিসেবে তা মর্যাদা পেল এবং সেটাই হয়ে দাঁড়ালো নতুন চ্যালেঞ্জ। রেকর্ড প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি রাতারাতি বরেণ্য বীর হয়ে গেলাম। এই চ্যালেঞ্জ প্রবৃত্তির জোরেই মানুষ আজ সাতফুট উ'চুতে লাফিয়ে উঠতে পারছে, চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ

দৌড়াচ্ছে, সতের মিনিটে ১৫০০ মিটার সাঁতরাবার সম্ভাবনাও আসন্ন করে এনেছে। মানুষের দৈহিক সামর্থ্য আজ কতদূরে পে'ৗচেছে পঞ্চাশ বছর আগের রেকর্ডগুলির সঙ্গে আজকের রেকর্ড তুলনা করলে তাজ্জব লেগে যাবে। একটা উদাহরণ দিই আমাদেরই দেশ থেকে। ১৯৩৪ সালে রাজারাম সাহু ১ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার চীৎ-সাঁতার কেটে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছিল, আর বর্তমানে সে রেকর্ড হল ১ মিনিট ১১% সেকেণ্ড; এমন কি কিশোরী সন্ধ্যাচন্দ্রও ঐ বিষয়ে ১ মিমিটে ২৭·৬ সেকেণ্ডের বেশী সময় নেয় না। এমন ঘটেছে সারা দুনিয়ায়, সর্ববিষয়ে, পুরুষ এবং নারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে এবং তা সম্ভব হয়েছে এই চ্যালেঞ্জ প্রবৃত্তির জোরে।

খেলার মাঠের রেকর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বরে রেকর্ড করার চেয়ে বেশী ইজ্জত পায় বলে অনেকে দুঃখ করেন। কিন্তু পরীক্ষা নম্বরের রেকর্ড সঠিক পরিমাপযোগ্য নয় বলেই তা নিয়ে মাতামাতি করার রেওয়াজ নেই, তাছাড়া তাতে পুরো নম্বরের সীমা বে'ধে দেওয়া আছে। খেলার রেকর্ডের পরিমাপ হয় মাপের ফিতে ও ঘড়ির কাঁটায়, যা সর্ব দেশে সর্ব কালে এক। আর পরীক্ষার রেকর্ড নম্বর প্রশ্নপত্রে ও পরীক্ষকের নম্বর দেওয়ার স্বভাব-প্রবণতা ও সাময়িক মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। তাই সাঁতার, এথলেটিকস্ ওয়েটলিফ্টিং প্রভৃতির রেকর্ড স্থানকালপাত্রনিরপেক্ষ, ক্রিকেট রেকর্ডের চেয়ে অধিকতর গ্রাহ্য।

কিন্তু এর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ আছে, যাতে রেকর্ড প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একথা ঠিক যে মাউণ্ট এভারেস্ট জয় একবারই হয়েছে, বিজয়ীদের সম্মান অক্ষয় হয়েই থাকবে। তবু এরপর যদি কেউ সেই শৃঙ্গে ওঠে তার সেই সাধারণ আরোহণ-কর্মও অনন্যখ্যাতি ও কৃতিত্বের নিদর্শন বলেই গ্রাহ্য হবে নিঃসন্দেহে। কারণ এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ কর্মটি এমনই দুরূহ যে, কোনদিন কোন সময়ে তা সাধন করতে পারলেই আরোহী অসাধারণত্ব দাবী করতে পারবে। এই ধরণের চিরন্তন চ্যালেঞ্জএর নিশিডাকে কতলোক প্রাণ দিয়েছে তার গোণাগুণ্তি নেই। প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেও অক্ষতদেহ অনেক সময়ই সম্ভব হয়না, আর যদি হয় অমানুষিক কষ্ট সহ্য করা অপরিহার্য। অথচ এই কষ্ট সহ্য করতে হয়, অঙ্গহানির আশঙ্কা প্রবল, প্রাণনাশের আশঙ্কাও সুদূরপরাহত নয় বলেই তো ওই সব চ্যালেঞ্জের এত আকর্ষণ।

গৃহবলিভুক পারাবতের কূজন শুনে সুশীতল ছায়া নদীটির ধীর প্রবাহের ধারে প্রিয়ার আঁখি বাখানি কাব্যরচনা করে চূড়ান্ত নিরাপত্তায় জীবনযাপনে যারা অভ্যস্ত, তারা বড়জোর প্রথম যৌবনোচ্ছ্বাসে প্রভঞ্জনের বিবাগীমনের দোলা লেগে মননাচার কবিতা লিখতে পারে। তারপর পৃথিবীর বিশালত্ব ও আকাশের অসীমত্ববোধে যে ঘরের দেয়াল একদিন ফেটে চৌচির হয়েছিল, তারই চারপাশে আবার নিশ্ছিদ্র দেয়াল গে'থে নিয়ে একদিন তাকে বলতে হয়, 'ছাদে যেয়ো নাকো—যেখানে আকাশ সীমানাহীন, তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা স্বপ্ন সব হবে বিলীন।'

দুঃসাধ্য সাধনের বাস্তব সার্থকতা জমাখরচের হিসাবনিকাশে কি দাঁড়াবে জানিনা, তবু এটুকু সহজ ঐতিহাসিক সত্য যে যারা আরাম ও নিরাপত্তার সাধনা করে, নেহাৎ সোনার চামচ মুখে দিয়ে না জন্মালে, ভাগ্যে তা জোটেনা। তার চেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর দুরারোহ গিরিচূড়া দুস্তর মরু পার হবার সাধনা করে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে হাজার বাধা উড়ে চলে যায়, তাদের সাধনালব্ধ মনোবলের প্রবল প্রভঞ্জন-আঘাতে।

এই যে একটি আমার আপনার মত সাধারণ ঘরের মেয়ে আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এল, এশিয়ার কোন মেয়ে যা কোনদিন করেনি সেই সার্থকতায় সে মহীয়সী হয়ে

উঠলো কিনা জানিনা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা এবং সার্থকতার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করেছিল, তা রক্ষা করার পদে পদে সে দুর্লভ চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে।

সহায় সম্বলহীন একটি নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙলী মেয়ে বিদেশ যাবার জন্য অনুমতিপত্র, পাসপোর্ট, বিদেশীমুদ্রা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় দরজায় দরজায় ধাক্কা খেয়েছে। কোন দরজায় ধাক্কা মারতে হবে না জেনে এখান থেকে ওখানে ছিটকে পড়েছে, ঠিক দরজায় ধাক্কা মারলেও তা খোলেনি। যে ধাক্কা এখানে খেতে হয়েছে তাকে ইংলিশ চ্যানেলের বিশাল ঢেউ ও প্রবল স্রোতের ধাক্কা তার কাছে তুচ্ছ। এমন হিমেল মনোভাবের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয়েছে যার তুলনায় ইংলিশ চ্যানেলের ষাট ডিগ্রি জল যথেষ্ট সহনীয়। কিছুতেই ভেঙে পড়েনি মেয়েটি, আশা ছাড়েনি ক্ষণিকের জন্য, আর সবার কাছে দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবেদন করেছে, পাঠিয়ে দিন, ঠিক পার হয়ে ফিরবো।

এই যে আত্মবিশ্বাস, ওই যে দৃঢ় প্রত্যয়, কোন বাধায় প্রতিহত না হবার ইস্পাত কঠিন মনোভাব, এরই জোরে তার পক্ষে বছরের শেষ সম্ভাব্য অবস্থায় ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া সম্ভব হল, ডোভারে বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন।

যেদিন আরতি সাহা সাঁতারে নামেন তার আগের কদিন সাগরের বুকে দুঃসহ দুর্যোগ। আর সেই সময়ই খবর বেরুলো একজন ঝানু সাগর সাঁতারু আইরিশ সী পার হতে গিয়ে মারা গেছে। ভয় নিশ্চয়ই জেগেছিল তার মনে, কিন্তু কবির কাব্য বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তাঁর মধ্যে, বিপদ আছে জানি আঘাত আছে, তাই বলে তো বক্ষে পরাণ নাচে।

আরতি সাহা সার্থক হয়ে ফিরেছেন। কিন্তু চো ওয়ু অভিযাত্রী নারীদলের অধিনায়িকা মিসেস কোগান এবং অপর সদস্যা মিস ভন্ স্ট্যাটেন জনৈক সেরপা সমেত হিমালয়ের চির-তুষারে সমাহিত হয়েছেন। তাদের জন্য কোন দীর্ঘনিশ্বাস বা তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াসের কোন জয়ধ্বনি এদেশে শোনা যায়নি, এক যুগান্তরে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়া। অথচ মেয়েদের কতদূর পর্যন্ত অভিযান প্রয়াসী হওয়া উচিত, তা নিয়ে উপদেশ বর্ষণে ত্রুটি হয়নি।

মানুষ চিরদিন মরেছে, স্বভাবমৃত্যু, মহামারীতে মৃত্যু, যুদ্ধে মাছির মত কাতারে কাতারে মৃত্যু, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক মৃত্যু, দুর্ভিক্ষে বাঙালীর মৃত্যু, মানুষের নিজের পাশবিকতার পরিণামে মৃত্যু—এই অজস্ররকমের মৃত্যুর পথ পার হয়ে চলে এসেছে মানবজাতি, আজও চলেছে সেই মৃত্যুসংকুল পথে। মৃত্যু তাই কোন অঘটন নয়, মৃত্যুতে সংবাদ হয়না, হয় মৃত্যুঞ্জয়ী প্রয়াসে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করার দুর্জয় প্রচেষ্টায়। অথচ পরের দুঃখে কাঁদায় অভ্যস্ত আমরা আজও মহৎ দেখে কাঁদতে শিখলাম না। কাঁদতে না পারি ক্ষতি নেই। অন্তত দুয়ো দেবার, নাকসিটকে এবং আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দেবার মনোভাব যেন ছাড়তে পারি।

সবচেয়ে দুঃখের কথা সংবিধানে সমান অধিকার দিয়েও ভারত সরকার মেয়েদের দুর্জয় দুঃসাহসিকতা বরদাস্ত করতে পারছেনা। ডাঃ বিধান রায় শুনেছি আরতি সাহার কৃতিত্বে অভিভূত হয়ে বলেছেন তাঁর সরকারে মেয়ে অপবাদে কাউকে কোন কাজে অযোগ্য বলে চাকরীতে নিয়োগ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু ভারত সরকারের মনোভাব অন্যরকম।

ফ্লাইট লেফটন্যান্ট ডাঃ কুমারী গীতা চন্দকে অবশ্য দশ বারো বার টেস্ট দেবার পর যথানিয়মে প্যারাশুট বাহিনীতে নেওয়া হয়েছে, যাতে কোন দুর্গমস্থানে সাহায্য পৌঁছবার প্রয়োজনে ডাক্তার হিসেবে তিনি অন্তত প্যারাশুটে চড়ে সাহায্য সেবা ও চিকিৎসা নিয়ে হাজির হতে পারেন।

কিন্তু আর একটি বাঙালী মেয়ে বিমান চালনায় যিনি দক্ষতার অপরিমেয় কৃতিত্বের প্রমাণ নিত্য দিচ্ছেন সেই কুমারী দূর্বা ব্যানার্জীকে বলা হয়েছে, মেয়েছেলে আবার প্লেন চালাবে কি, চাকরী চাও তো এয়ার হোস্টেস হও। হায় যিনি গত দুবছরে দুহাজার ঘণ্টায় কমপক্ষে তিন লক্ষ মাইল যাত্রী ও মালবাহী বিমান চালিয়ে অনেক দুর্গম স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন, কোন দুর্যোগ যাঁর বিমান-যাত্রা এক দিনের জন্য বন্ধ করতে পারেনি, আবহাওয়ার বা যন্ত্রের কোন প্রতিকূলতা যাঁকে অস্থানে অসময়ে ভূপাতিত করতে পারেনি, কেবলমাত্র নারীত্বের অপরাধে তাঁকে বলা হল, ছিঃ প্রজাপতি হয়ে ফুর ফুর করে উড়তে চাও তো সমর্থন করতে রাজি আছি। শ্রীমতী ব্যানার্জী মুখের মত জবাবই করেছিলেন! বরং স্কুল মাস্টারী করবো।

রেমার্ক যে মন্তব্য করেছিলেন, যারা নিরন্তন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থাকে মৃত্যু তাদের কাছে কোন অ্যাডভেঞ্চার হতে পারেনা। শ্রীমতী ব্যানার্জীর প্রতিদিনে এই ওড়ার মধ্যেও হয়তো অসাধ্যসাধনের অসাধারণত্ব স্বীকৃতির অবকাশ নেই। তবু তিনি অনন্যা এবং সমগ্র ভারতীয় নারীজাতির হয়ে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। আশ্চর্য দুইরাষ্ট্রে বিভক্ত ভারত ভূখণ্ড থেকে যে চারজন ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছে এবং সার্থক হয়েছে সবাই বাঙালী। হিমালয় অভিযান শিক্ষার্থীর সংখ্যা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, কিন্তু আবেদনকারীদের মধ্যে বাঙলার ছেলেরা আজও সংখ্যাগুরু। চো ওয়ু অভিযাত্রী দলে তেনজিংএর কন্যা এবং ভাগ্নী দুজনই বাঙলা রাজ্যের নাগরিকা। আর বর্তমানের তিন-জন অনন্যা ভারতীয় নারী আরতি সাহা, গীতা চন্দ এবং দূর্বা ব্যানার্জী সবাই বাঙালী, কালো দীঘিজল তারি সুশীতল মায়া যাদের দুটি চোখে, দেহে যাদের শ্রাবণ মেঘছায়া।

সত্যি যে কটি মেয়ে আজ এই দুর্জয় পথের পথিক হয়েছে তাদের প্রত্যেকে নারীত্বের স্বভাবমাধুর্যে সরস। দুর্দম দুঃসাহসিকতা তাদের নারীত্বকে দেহেমনে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেনি। যে দুটি ইয়োরোপীয় মহিলা চো ওয়ুতে প্রাণ হারালেন তাঁরা বৃত্তিতে, পোষাক ও রূপচর্যাকারিণী অর্থাৎ নারীত্বের মোহবর্দ্ধিণী। যতই দুঃসহ কাজে ব্রতী হন, নারীত্বের বৈশিষ্ট্যে তাঁরা বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য প্রাচ্য নির্বিশেষে নারী অ্যাডভেঞ্চারার নারীত্বকে কোথাও আঘাত হানেনি, এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ভারতের গ্ল্যামারনগরী বোম্বাই এবং রাজধানী দিল্লীতে রঙচঙে পুতুল হয়ে নেচে বেড়ানই আজ নারীদের চরম পরাকাষ্ঠা এবং প্রগতির প্রধান লক্ষণ। আর এই ঢিলেঢালা বাঙালী মেয়েদেরই কজন কিনা জীবনের সবকটি বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে সার্থকভাবে। কে জানে সেই জন্যই হয়তো দিল্লীকেন্দ্রিক ভারত সরকার মেয়েদের এই ষেঁড়োমিকে আমল দিতে চাইছেনা। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ দেবে। আর মগজাভিমানী বুদ্ধিজীবী যাঁরা তাঁরাও কি পারবেন না এই সব চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারিণীদের প্রকৃত সামাজিক মূল্য নিরূপণ করতে? যদি না পারেন তো বলবো, আমাদের দুর্দিনের ঘোর আজও কাটেনি।

রাখাল ভট্টাচার্য

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতার প্রভাব।

একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধু সেদিন আক্ষেপ করে বলছিলেন : স্বাধীনতার পর যত বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে, ততই যেন আমরা স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

স্বাধীনতার মর্মবাণীকে আমরা স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে বার বার উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেও নিষ্ফল হচ্ছি। আজকের সাহিত্য স্বাধীনতা থেকে আর কোন অনুপ্রেরণাই খুঁজে পাচ্ছেনা।

নিতান্ত বেদনার সঙ্গে হলেও সাহিত্যিক বন্ধুটির এই আক্ষেপ সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব না করে পারিনি। স্বাধীনতার মঙ্গলশঙ্খ বাজবার পর একটি ঐতিহাসিক যুগকে তো আমরা অতিক্রম করতে চললাম। এ যুগ পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। অনেক কিছু আমরা ভেঙেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে অনেককিছু গড়বারও চেষ্টা করেছি। একদিকে আমাদের ভংগুর সমাজ ব্যবস্থার রিক্ততা দিনে দিনে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের কায়েমী স্বার্থের ষড়যন্ত্রে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এক নতুন সৃষ্টিযজ্ঞের হোমানল সমগ্র দেশজুড়ে প্রজ্বলিত হয়েছে, পরনির্ভরতার দুঃসহ অপমান আজ অস্তমিত। আমাদের যা কিছু ক্ষোভ, যা কিছু অভিযোগ আজ সবই নিজেদের বিরুদ্ধে। আমাদের সামগ্রিক জীবনে সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে, বিক্ষোভ আরও পুঞ্জীভূত হয়েছে। কিন্তু একদিক থেকে দেখতে গেলে এই সমস্যাই নতুন নতুন সংগ্রামে আমাদেরকে প্রণোদিত করেছে। নিত্য নতুন সংঘাতের মধ্যদিয়ে আমরা মহাজীবনকে সামগ্রিকভাবে লাভ করবার এক সমীহা করে চলেছি।

আমাদের মনে হয় স্বাধীনতার বাইরের রাজনৈতিক রূপটি নয়, তার এই অন্তর স্বরূপই স্বাধীনতার মর্মবাণী। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বাধীনতার এই অন্তর স্বরূপটি স্বাধীনত্তোর যুগের বাংলা সাহিত্যে কতখানি প্রতিভাত হয়েছে? অর্থাৎ আজকের সাহিত্য স্বাধীনতা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে কতখানি? ৪৭'এর আগস্টের পর সমগ্র দেশ ও জাতির উপর দিয়ে যে এক নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে গেছে, এবং যার ফলে আমাদের একশ' নব্বই বছর ধরে গড়ে তোলা জীবন সম্পর্কে এক নির্দিষ্ট মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, সে পরিবর্তনকে আমরা বাইরে থেকে যতই 'ঝুটা হ্যায়' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করিনা কেন আমাদের অবচেতন মন থেকে তাকে উচ্ছেদ করবার কোন উপায়ই আমাদের অবশিষ্ট নেই। তাই সমকালীন বাংলাসাহিত্যে যদি জীবনবোধের এই পরিবর্তিত রূপটি যথার্থভাবে ফুটে উঠতে না পারে, তাহলে সে সাহিত্যকে আমরা জীবনের খাঁটি সমালোচনা বলে কখনই অভিহিত করতে পারব না। 'প্রগতির' শীলমোহরে তাকে বার বার চিহ্নিত করলেও না।

অথচ একটা যুগ ছিল যখন সাহিত্যমাত্রই ভারতআত্মার বাণীকে মূর্ত করে তুলেছে। সাহিত্যিকের নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনপ্রকাশ যে ছিলনা তা নয়, বরং তা বেশী করেই ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমগ্র দেশ ও জাতির ভাবনার সাথে সাহিত্যিকের ভাবনা এক অপূর্ব সাযুজ্য লাভ করেছিল। 'স্বাধীনতা হীনতায়' বেঁচে থাকা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব এই চেতনাই রঙ্গলাল থেকে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বাধীনতা পূর্বযুগের সমস্ত লেখকেরই ব্যক্তিসত্তাকে আচ্ছন্ন করেছে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারা এক নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের বিশ্লেষণী আলোকে জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দেখার প্রবৃত্তি, মার্ক্সীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে সমাজের মৌল সমস্যাগুলি সমাধানের প্রবণতা ও কামার কুমোর, ইতর ও বেদে শ্রেণীর মানুষের জীবনের নবমূল্যায়ন, বাংলা সাহিত্যের এক নূতন দিগ্‌দর্শন করেছে। কিন্তু এ যুগের সাহিত্য যতই বিভিন্নমুখী হক না কেন, সমাজ জীবনের বহুবিধ সমস্যার ভীড়ে, 'স্বাধীনতার' পবিত্র দীপশিখাটি একেবারে হারিয়ে যায়নি। বরং স্বাধীনতা লাভের যে বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণার মূলে আছে মানুষের

ভিতর পারস্পরিক সাম্যবোধের নবজাগৃতি, গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং শ্রদ্ধা, সাহিত্যের সে নতুন ধারা ছিল আমাদের সে বৈজ্ঞানিক চিন্তারই অনিবার্য পরিণতি। রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আমরা যে স্বাধীনতা চেয়েছি সর্বস্তরে তাকে সফল করে তুলতে হলে যে চাই অবজ্ঞাত মানুষগুলোর বিভেদবন্ধন রজ্জু কেটে দেওয়া এইরকম এক ধারণাই আমাদের সে দিনের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে কাজ করেছে। তাই একটি স্বাধীনতাকামী পরাধীন জাতির আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে উঠেছে সে যুগের সাহিত্যে।

সে যুগের এই গণতান্ত্রিক চেতনা স্বাধীনত্তোর যুগের সাহিত্যে অবশ্য আরও পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। বাংলাসাহিত্যের ভৌগলিক পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে। সুদূর নাগাপাহাড়ের মানুষেরা আজ বাংলা সাহিত্যে ভিড় করেছে, দক্ষিণ ভারতের বিচিত্র আদিবাসী দেবতার কাজে আত্মসমর্পিতা দেবদাসীর রোমাঞ্চকর উপাখ্যান থেকে শুরু করে মালাবার উপকূলের মৎস্যজীবিরা পর্যন্ত আজ বাংলা সাহিত্যের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে। কাছে থেকে দূরে যারা তাদের বাণীও আজ বাংলা সাহিত্যে শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটি মনের মাঝে থেকে যায়, সেটি হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা আমাদের দেশের এই বিচিত্র মানুষগুলোর সমাজ ও জীবনকে কতখানি প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হয়েছে? স্বাধীনতার প্রভাতী সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে একটি জাতির চিন্তা, ভাবনা, আশা, আকাঙ্খা যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণার যে সুস্পষ্ট বিবর্তন ঘটে, এই সুনির্ধারিত বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বাক্ষর কিন্তু আজকের যুগের সাহিত্যে সুস্পষ্ট ভাবে পড়েনি। যে যুগচেতনা কাল ও কলার সার্থক সমীকরণ ঘটায়—এই বিচিত্র জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যে সে যুগচেতনার প্রভাব আজও বহুদূরে।

একজন সুধী সাহিত্য-সমালোচক এক আলোচনা প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলছিলেন যে বাংলাভাষায় "মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ, ও খণ্ডিত স্বাধীনতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কোন 'ওয়ার অ্যান্ড পীস্' লেখা হয়নি।" কথাটি মর্মান্তিকভাবে সত্য। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর 'পল্লীসমাজ' বা 'পণ্ডগ্রাম'ও আর নতুন করে বাংলাভাষায় লিখিত হলনা। গ্রাম সম্পর্কে এখনও শহরবাসীদের যা ধারণা তা পল্লীসমাজ বা পথের পাঁচালী থেকে। অথচ 'পণ্ডগ্রামে'র সে গ্রামীন সমাজ যে আর নেই, বহুবছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রামীন চণ্ডীমণ্ডপগুলিতে যে অকর্মণ্য পক্ককেশ বৃদ্ধদের মজলিসের পরিবর্তে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বসছে, বিদ্যুৎ যে শুধু গ্রামের অন্ধকার ঘোচায়নি, কুটীরশিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে যে একটা বিরাট বিপ্লবের ইশারা নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে এ ধারণা এখনও তাঁদের মনে বদ্ধমূল হতে সক্ষম হয়নি। জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা, পল্লীগ্রন্থাগার, বেতার, গ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যসূচী, শিক্ষার প্রতি গ্রামীনমানুষের অসীম আগ্রহ, সর্বোপরি চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ এবং সর্বগ্রাসী প্রভাব আজ স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষের গ্রামীনজীবনের এতদিনকার সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তাদের মননকে প্রধাবিত করেছে। এর মাঝে দলাদলি আছে, কখনও তার রূপ ব্যক্তিগত, কখনও বা রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক, তার মাঝে দারিদ্র্যের মর্মপীড়া আছে, বহুধাবিভক্ত সমস্যা আছে, এবং কিছু সরকারি কর্মচারিদের অসাধুতার প্রতি ক্ষোভ আছে, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে স্বাধীনতার এক নবলব্ধ চেতনা (এ চেতনা হয়ত বেশীর ভাগ সময়েই পরোক্ষ) তাদেরকে এক বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এই নবচেতনার বাণী, ও সমাজের বহিরঙ্গের এই পরিবর্তিত রূপটি আজকের সাহিত্যে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের জমিদার এবং সামন্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বহু শক্তিশালী সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু জমিদারী প্রথার নিঃশব্দ অবলুপ্তির পর বাংলাদেশের জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্য রাজনীতিকে ব্যবসায় আর ব্যবসাকে রাজনীতিতে রূপান্তরিত করার অপচেষ্টা, সাধারণ মানুষের প্রতি ক্ষোভ আর অনুকম্পা মিশ্রিত উদারতা তাদের চরিত্রকে আজ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। সাধারণ চাষী শ্রেণীর মধ্যে নূতন মর্যাদা বোধ, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসানে নূতন আমলাতান্ত্রিক শোষণের আশংকা, জমিতে অধিকার ফিরে পাবার আশা, ভূদান আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, সমবায় কৃষি এগুলি স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পরিবর্তিত জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে কোন উল্লেখ্য সাহিত্য কীর্তিই এখনও রচিত হয়নি। উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু একটি সমাজ ও সংস্কৃতিকে চুরমার করে ভেঙে উৎকেন্দ্রিক ছিন্নমূল মানুষগুলো রিফ্যুজি ক্যাম্পে বা শেয়ালদ স্টেশনে প্লাটফর্মে দিন কাটাচ্ছে এটি তাদের একটি পরিচয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় নয়। একদিক থেকে তারা যেমন 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' অপরদিক থেকে গড়ছে শুধু গড়ছেও। জঙ্গল কেটে নূতন উপনিবেশের পত্তন করছে, বন্ধ্যামাটির বুকে তারা সোনার ফসল ফলাচ্ছে। শেষের দিকের এ স্পন্দন বাংলা সাহিত্যে সার্থক ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠছে না কেন?

কবিতার ক্ষেত্রেও বিচিত্র আঙ্গিক, বহুবিধ ধ্যানধারণা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে নিয়ে আজ পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে কিন্তু যে চারণকণ্ঠ একদিন কবিতার মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার স্তোত্র-সংগীত রচনা করেছিল সে কণ্ঠ আজ নীরব। নাটকের মধ্যেও জাতির সে মুক্তির বাণী আজ প্রায় অনুপস্থিত। শুধু দু'একজন প্রবন্ধকারের লেখনীর মধ্যে স্বাধীনতার অস্পষ্ট কল্লোল এখনও শোনা যায়।

আজ একথা ভুললে চলবে না, সমাজজীবনের যে চিরাচরিত সমস্যাগুলি এতদিন সাহিত্যের প্রধান উপাদান ছিল, স্বাধীনতার পর সে সমস্যাগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। পতিতা-বৃত্তি, পণপ্রথা, অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ এগুলি এককালে সমাজের প্রধানতম সমস্যা ছিল, আজ তাতে চিড় ধরতে শুরু করেছে; অদূর ভবিষ্যতে এগুলি আর সমস্যা বলে বিবেচিত হবে না। তার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমস্যাই ক্রমশ সামাজিক সমস্যাগুলিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠবে। দর্শন ও জীবনজিজ্ঞাসাই আগামীকালের সাহিত্যে প্রাধান্যলাভ করবে। সমস্যা যদি থাকে তাহলে ভাঙার সমস্যা নয় কি ভাবে আরও ভাল করে নতুন করে গড়ে তোলা যায় এই সমস্যা। আজকের সাহিত্যে আগামী যুগের এই শিল্পরীতি ও জীবনদর্শনের ইশারাই পড়া উচিত।

পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্ষণজীবী বাক্যপতংগ ও নিঃসংগ পাঠক

ক্ষণজীবী বাক্যপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনিতে কান দিতে গেলে অন্তরের বাণী শোনা যায় না—এমন ধরণের সদ্‌বাক্য রবীন্দ্র ঠাকুর পঁচিশছাব্বিশ বছর আগে উল্লেখ করেছিলেন অমলহোমকে লেখা কোন চিঠিতে। কথা কয়টি বলবার সময় কবিগুরুর মনে ছিল অতি-আধুনিক সাহিত্য নিয়ে কোলাহলের রূপ নেয়া তর্কবিতর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

পঁচিশছাব্বিশ বছর পরে বাক্যপতঙ্গের তুমুল ঝাপটানিতে বাংলা সাহিত্যের হাট আরো সরগরম। সে বাক্যপতঙ্গগুলোর প্রায় সবটাই ক্ষণজীবী। এ ঝাপটানির ক্লান্তি নেই বলেই মনে হচ্ছে ক্ষান্তিও নেই।

বাক্যপতঙ্গের নিদারুণ অক্লান্ত ঝাপটে আমার একবিন্দু বিরক্তি নেই, যদি বাক্যপতঙ্গ-গুলো সদ্‌ভাবে বাঁচবার সদ্‌ ও দুর্দ্দান্ত তাগিদে ঝাপটায়। এবং সে তাগিদে যদি বাঁচবার গরজে রণে অকালে প্রাণ-ও দেয়, সে ক্ষণজীবীদের প্রতি আমার অমলিন শুভেচ্ছা সবসময় থাকা উচিত।

যখন দেখি জীবনের কোনরকম অস্তিত্বের জন্যে লড়তে গিয়ে মানুষের প্রাণের সলতে অচিরেই ফুরিয়ে যায়, তখন যদি কেউ জীবনকে নিয়ে ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীটে, কিড ষ্ট্রীটে গিয়ে উল্লসিত তরঙ্গে নৃত্যায়িত হন, নাইট ক্লাবের সে পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি থাক শতসহস্র ধিক্কার। ঘৃণা। এরকম পৃষ্ঠপোষকরা বাংলা বাক্যপতঙ্গ হয়ে কলেজ ষ্ট্রীটে ভীড় করছেন। আশ্চর্য, এদের গুঞ্জনধ্বনিতে পাঠক প্রলুব্ধ। পাঠকের প্রলোভনমুখীতা এদের চিত্তে রীতিমত পুলকের সঞ্চার করেছে। এদের কার্যক্ষমতা শতগুণ বেড়ে যায়। বেড়ে-ও যাচ্ছে। এদের তরপাণিতে বাংলার গগন ফাটছে—এখবর জানতে হলে আপনাকে আমাকে নিঃসঙ্গ হতে হবে। নিঃসঙ্গ না হলে আপনি আমি দেখব, এরা হল্লার ধুলোর চোটে সূর্যটাকে বুঝি অত্যন্ত ময়লা ঝাড়ন দিয়ে মুছেই ফেলছেন। তারপরে আকাশে কোন চিহ্ন আছে কিনা—এ জানতে গেলে আপন সাম্রাজ্যে নিঃসঙ্গ সম্রাট হতে হবে। নিঃসঙ্গ হলে আপনি বুঝবেন, বাক্যপতঙ্গরা ড্রইংরুমের মদিরাপাত্রে উড়ছে। ড্রইংরুমের বাইরে অগুণতি লোকের ভীড়। জীবনধারণের নিদারুণ গ্লানিমাখা মুখে শিরানীল-হাতের শূন্যপাত্র নিয়ে জনতা জানের জন্যে, প্রাণের জন্যে চীৎকার করছে। আর ভিতরে বিলসিত অস্তিত্ব। কে শোনে কার কথা? চোরা শোনে কি ধর্মের কাহিনী? এ বাক্যপতঙ্গরা যে ক্ষণ-জীবী এতথ্য-ও আপনি জানতে পারবেন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের শাণিত আলোয়।

সাহিত্যের উন্নতিতে সিনিকদের কোন দায় বা দায়িত্ব নেই। সেখানেই তাদের মস্তিষ্কসঞ্চালনের সহজ মুক্তি আছে। মুক্তি যেখানে সহজ, সেখানে মুক্তি সাধনার পথ-ও কণ্টকমুক্ত। কুসুমাস্তীর্ণ।

আবার, স্বাতন্ত্র্যচর্চায় যাদের বিশেষ মোহ আছে, অভিনবত্বের কিম্ভূত আরাধনা তাদের স্বভাবমিশ্রিত ব্যাপার। তাদের স্বতন্ত্র হওয়ার বিশেষ প্যাটার্ণের আদি ও অন্তের ভিতর বিরাট ফাঁক। তাদের নিশ্চিতধারণা, এফাঁক আদতে ফাঁকই নয়। সনাতন রুচির সম্ভাবনা তাদের অভি-নবত্বতে চিনতে পারে না বলেই এটাকে ফাঁক বলে চীৎকার করা হয়।

এসঙ্গে আরো একটি কথা মনে এল। সস্তা জনপ্রিয় হবার জন্যে একদল সুভাষিত ভদ্রলোক সাহিত্যে 'ডিমাগগি'র শরণ নিয়েছেন। বস্তুটি রাজনীতির সম্পত্তি বলে জানতাম। জনসাধারণের সস্তা আবেগে, সস্তা সংস্কারপ্রিয়তায় কাতুকুতু দিয়ে রাজনীতিক বক্তা অর্ধসত্য, মিথ্যাভাষণে নিজেকে জনপ্রিয় করেন। এথেন্সের ভীষণ দুর্দ্দিনে এশব্দটি জন্ম নিয়েছিল। এখন বাংলাদেশে এদের চমৎকারিত্বে, ভঙ্গীর শাণিত মার্জনায় পাঠকচিত্ত যেন লালিত্যবিহার করতে পারলে মজে যায়। জনচিত্ত মার্জনার কোন প্রয়োজন তাদের জীবনে মোটেই অনুভূত হয় না। এ ভদ্রলোকেরা জীবনলক্ষ্যে এ সত্যটি মালুম করেছেন এবং তা চূড়ান্ত ভেবেছেন, "উই আর লিভিং ইন্‌ এ মানি কালচার"। তারা নিজের পুত্রস্ত্রীকন্যার পারিবারিক গণ্ডীতে চুপচাপ ভাবতে চেষ্টা করেন, 'সেক্স ইজ্‌ এ সিন্‌'। কিন্তু জনপ্রিয় হবার কথা মনে আসতেই তাড়াতাড়ি মনটাকে চাবুক মেরে (?) শেখাতে লাগেন, ইয়েট সেক্স ইজ্‌ প্যারাডাইস্‌।

কোন সৎ পাঠক যদি নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের চর্চ্চায় ডুব দিয়ে জনতার বিশাল বিকাশে আপন

অন্তরের বাণী খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেন, তবে বাংলা সাহিত্যের লাভ তাতে পুরোদস্তুর। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের অটল গাম্ভীর্যে যিনি বিচারদণ্ডটিকে সিধা রাখতে চান, তার কাছে এগুলো স্পষ্ট হবে।

প্রথমতঃ, তারা সিনিক হবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, অভিনব ও স্বতন্ত্র হবার দুর্বলমোহে কিম্ভূতকের খোলসে মুখ ঢাকবেন না।

তৃতীয়তঃ, সস্তায় জনপ্রিয় হবার ভাঁটিখানায় গুলজার হবেন না। এরকম সৎ সাহিত্য-পাঠক বাংলাদেশে দরকার হয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বের চর্চ্চায় ব্যক্তির পরাজয় যদি ঘটে, তবে তা ব্যক্তির লাভ তথা সমষ্টির লাভ-ও।

ব্যক্তির লাভ, কেননা, ব্যক্তি ফাঁকি বাজি করেন নি। আপনকে নিঙড়ে সর্বসারত্বটুকু অর্জন করতে তাকে ভীষণ যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। যার যন্ত্রণা আছে, তার পরাজয়েও জয়ের সান্ত্বনা আছে। লড়ে হারা-ও একরকমের জিৎ।

সমষ্টির লাভ, কেননা, একজনের যন্ত্রণাময়তায় সমষ্টির প্রতিকৃতি আছে। লক্ষজনের একক বিচ্ছিন্ন সংপরাজয়ে, সমষ্টির অভিজ্ঞতার চরিত্র খুবই মূল্যবান হয়।

নিজের বিচারবুদ্ধিতে মানতে পারেননা, এমন কোন কিছু যা রবীন্দ্র ঠাকুর প্রশংসা করে গেছেন, বা রাজশেখর বসু প্রমুখেরা করছেন, তবে পাঠক যদি সেখানে লজ্জায়, সহায়হীনতায় মেনে নেন সেখানে তার পরাজয় কোন কাজেই লাভবান হবে না। এ পরাজয় হীনতা ছাড়া কিছু নয়। বাংলাদেশে এমন নিঃসঙ্গ পাঠক খুবই কম। দলে-ভেড়া পাঠকেরাই সস্তা লেখককে কুতুব-মিনারে বসাচ্ছেন।

নিঃসঙ্গ পাঠকচরিত্রের কাছে শরণ নিতে বাধ্য হলাম একারণে যে বইপাটিকে বইপাট্টি এবং মর্যাদায় মূল্যবান, সম্ভ্রমে শ্রদ্ধাবান লেখকপাড়া করে তুলতে গেলে বৈঠকখানার হল্লাকে ওখান থেকে তাড়াতে হবে। এবং তাড়াতে তারাই পারেন। সাহিত্যের শাসন, সাহিত্যিকদের চেয়ে তাদের হাতেই দেওয়া উচিত।

তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত জনপ্রিয় লেখকদের পর (ধূর্জটী প্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য—এঁরা এদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা আশি না হলে জনপ্রিয় কখনোই হবেন না। ইউরোপে এঁদের স্থান হলে ভাল হত) যে বাকাপতঙ্গের দল জন্ম নিচ্ছেন তাদের কথাই এখানে উল্লেখ করছি। ফাঁকে ফাঁকে অসীম রায়, অমিয় মজুমদার, সমরেশ বসু, বিমল কর অল্পবিস্তর আন্তরিক মন ও হৃদয়চালিত মননের অধিকারী হয়ে পড়লে-ও। অসীম রায়, অমিয় মজুমদারের সততাকে নিঃসঙ্গপাঠকরা স্বাগত জানালে-ও তারা ভরসা না পেয়ে অনেকখানি ক্ষুণ্ন, আপাত-অবসন্ন বোধ হচ্ছেন। একেবারে তরুণতমদের মধ্যে দু'চারজনের দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। হর্ষিত হবার কারণ যদি তৈরী হয়, সাহিত্যের মোড় পাল্টাতে পারে।

যাদের নাম করা হল তারা যে নিঃসঙ্গ পাঠকের মনের সমস্তটা জমি কেড়ে নিয়ে আছেন, এমন কথা বলা হল না। বলা হল, নিঃসঙ্গ পাঠক এদের ভিতর প্রতিশ্রুতির সন্ধানে ব্যস্ত। নাম বলা হল না এমন কয়েকজন লেখক-ও সে বিরল চক্করে পড়ে যেতে পারেন।

তবে এ আলোচনার লক্ষ্য বাকাপতঙ্গ কারা? এ প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করবার আগে একজন তরুণতম গল্পলিখিয়ের কথা বলে নিই। পূর্বাশার যুগে বহু গল্প লিখেছেন। সুখপাঠ্য গল্প। স্রেফ ড্রইংরুমের গল্প। তাকে সেদিন আড্ডায় জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কোন উপন্যাসে হাত দিয়েছেন কি?

তিনি উত্তরে বললেন, আমি আমার বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরী করতে পারি নি। উপন্যাসে হাত দেবার আগে আমার বহু ভাববার আছে। সমাজের ভিতর যেরকম বহুসহস্র যন্ত্রণাকাতর উপকরণ ছড়িয়ে আছে, সেখানে নিজের বিশ্বাস—জীবনবিশ্বাস সম্পর্কে দৃঢ় আশ্বাবান না হলে লেখার পরিণতিটা কি থোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোর ছাড়া আর কিছু হবে?

সে ভদ্রলোক কথাগুলো আন্তরিকভাবে বলেছেন বলেই বিশ্বাস। যে জীবনবিশ্বাসের কথা বলা হল, এটা নিয়ে যারা সাহিত্যের ভিটে আসতে চান তাদের মূল্যবোধ প্রকরকম।

আর যারা, সস্তায় বাজীমাৎ করার নামে বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন, তাদের আরেক রকম। তাদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন সৌখীন স্বচ্ছল ভদ্রলোক। কেউ পত্রিকাসেবী, কেউ পত্রিকার মালিক, কেউ প্রকাশক, কেউ অবশ্যপাল্য অধ্যাপক। এদের কাছে জীবনবিশ্বাস আদর্শ নয়। জামাকাপড়ের মত ঠিক স্থানে খোলা-ও যায়, আবার জায়গামত পরা-ও যায়। বুদ্ধ বসুর সাকরেদ হয়ে তারা ঘোষণা করছেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে অতএব এখন নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে আমাদের সাহিত্যে জনসেবার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।' স্বাধীনতা বস্তুটা এসমস্ত কোয়েসলার-প্রেমিকদের কাছে মনে হয়, একটা সমাজ-বিচ্ছিন্ন, রাষ্ট্রবিচ্ছিন্ন ব্যাপারের অন্তর্গত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বঞ্চনাতি, শোষণ, মানুষের স্টেন্টাসকো অবস্থা থেকে উন্নততর পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাওয়া এগুলো সম্পর্কে চিন্তার দরকারই পড়ে না। 'জনসেবার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করবে'—এরকম বৌদ্ধ-ভাষণে তাদের তৃপ্তি প্রচুর। কারণ, এতে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন পড়ে না। স্রেফ চোস্ত ইংরেজীবুকনির স্মার্টনেস দেখিয়ে, কেতাদুরস্ত পেণ্টলুনের মত এরা রংকরা মুখ নিয়ে শুধু শিল্পশৈলীর মার্জনায় ব্যস্ত। শিল্পশৈলীর উত্তুঙ্গ সাফল্যে সবচেয়ে সহজ মুক্তি হচ্ছে, শিল্প-বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। আরামকেদারায় বসে দূর দিগন্তের কল্পনামানসীকে ধরবার জন্যে এদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। তাদের কাছে, প্রেম জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষকে। ক্লান্তির পাহাড় নামে দৈনন্দিন জীবনে। মিথুনপুলকে অফুরান নৃত্য করতে মনে ঢেউ জাগে। বিষ্ণু দে-র ভাষায় বলতে হয়, 'সবজেকটিভ বোধের এলোমেলো টুকিটাকি কুড়িয়ে বেড়ান, পূর্বাপর নষ্ট করেন বাক্যটা বা হাঁড়িটা ঝেঁকে ঝেঁকে নেড়ে চেড়ে। অতীত ও বর্তমানকে জোড়েন চৈতন্যের ভবিষ্যতমুখী ত্রিকালে নয়, জোর করে ঠেসে ঠেলে বিচ্ছিন্ন বাক্যের মোচড়ে মোচড়ে। স্থান ও কালকে পাত্রে সংধৃত করেন না, কবিত্বময় শব্দের দড়িতে বেঁধে লাট্টুর মতো পাক দিয়ে দেন।' (আত্মঘাতী প্রতিভাবান ও পান্ডেরনাক ঃ অগ্রণী চৈত্র ১৩৬৫)। এ সমস্ত মহোদয়গণ উপরের কথাগুলোকে ভুলে যেতে পারলে আরামে তৃপ্তির খোঁজ পান। কারণ তারা ভাল করেই জানেন, একথাগুলো মনে রাখলে তাদের মুখের রং খসে পড়ে, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বাকচাতুর্যের নিরন্তর ধ্যানের ভন্ডামী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু শুধু কেন অপ্রীতিকর অবস্থার দাস হওয়া? তার চেয়ে এই ভাল, বাজারে বই বেরুচ্ছে। পারিশারের এজেন্ট দেশময় ছড়িয়ে পাঠাগারের আলমারীতে রেখে দিচ্ছে। নিজের কাগজে বা পারস্পরিক সম্প্রীতির স্বাক্ষরস্বরূপ অন্য কাগজগুলোতে আকাশস্পর্শী প্রশংসার স্তূপ ছড়ানো হচ্ছে। সভাসমিতিতে যাওয়া হয়। সেখানকার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোকদের সংগে কিঞ্চিৎ সাহিত্যালোচনা করা হয়। তার মাঝে নিজের কীর্তিটাকে নির্লজ্জের মত ঘোষণায় মন্দ লাগে না।

সামাজিক অর্থনীতিক অস্পষ্টতায় কী লাভ মিছিমিছি মাথা ঘামিয়ে? মুখস্থকরা বুকনিতে প্রকাশিত বৈদগ্ধ্যের দাম এ পোড়ো দেশে কোন্ মূর্খ দেবে না? নিজের অস্তিত্বই সমাজ-অস্তিত্বের প্রতীক। মানুষের জানের সংগ্রামে যখন চারদিকের আবহাওয়া থমথম করে

তখন এরা কে. সি. দাসের দোকান থেকে রসগোল্লা, ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশটা, বাজার থেকে রুইকাতলার টুকরোটা বা মাংসটা বা বার-এ গিয়ে সুপেয় পানীয়—এ সমস্ত তৃপ্তির প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ায় বোধ পরিপূর্ণতা লাভের জন্য তখন কাতর হয়ে পড়েন। উদ্বেগহীন পরিতৃপ্তিতে এরা সতেজ। শোষণকরা ব্যক্তিত্বে নিজেকে অধিকারী করার জন্যে এরা জবরদস্ত ডনজুয়ান (?) হ্যামলেট (?) হতে চান।

জীবনবিশ্বাস? জীবন জিগীষা? জিগীষার জ্বালা? সমাজমানসে নিজের ব্যক্তিচৈতন্যের তন্ময় ভাব? জীবনবিশ্বাসের ভিতর দিয়ে নিজের বলিষ্ঠ চেতনার প্রকাশ?

এতগুলো প্রশ্ন যাদের নেই, নিঃসঙ্গ পাঠক, আপনি তাদের অস্তিত্বকে কী বলবেন? বিলসিত বলবেন না? নিঃসঙ্গ পাঠক, আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি কোন্ সত্যসন্ধানে সাধক, কোন্ জিজ্ঞাসার দ্বারস্থ হয়ে ক্রমশঃ হোঁচোট খাচ্ছেন, রক্তে রক্তে বীভৎস হচ্ছেন—এ প্রশ্নগুলো যদি আপনার চোখে মুখে পাণ্ডুর বর্ণ দেয় তবে আপনি এ সমস্ত বাক্যপতঙ্গের গুঞ্জনে কান দেবেন কি? বুদ্ধ বসুর আজন্ম-পিপাসা 'An acre of green grass'। অচিন্ত সেনগুপ্তের রামকৃষ্ণ-মাহাত্মো কথার কদমফুল ফুটছে। নিঃসঙ্গ পাঠক আপনার এ তীর্থদর্শনের পর সুভাষের কবিতা যদি কানে আসে,

পেট জ্বলছে, খেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে?
হুজুর, এবার না বাঁচলে
আগুন জ্বলে উঠবে?

আপনার কী মনে হবে তখন? মিথুনপুলকের বিকৃত প্রকাশ আপনার শরীরে ঘৃণার জন্ম দান করবে না? ব্যক্তি-স্বাধীনতার নাম করে মানুষ শোষণকরা ব্যক্তিত্বের সাধকদের খাপছাড়া বৈদগ্ধ্যে আপনার চিত্ত কী রকম জানি পুলকিত বোধ করে!

পাঠক, আপনি ক্ষণজীবী বাক্যপতঙ্গের গুঞ্জন থেকে দূরে সরে আসুন। আপন সাম্রাজ্যে নিজেই সম্রাট হউন। রংকরা মুখের রং আপনা থেকেই খসে পড়বে। সাহিত্য জীবনময়তায় সমৃদ্ধ হবে। ভারতবর্ষের বাংলার গড়নের যুগ এখন। একমূল্যবোধের সূর্য অস্ত যাবার পথে। নতুন মূল্যবোধের উষা দেবীর মৃদু চরণধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জীবনের কাছাকাছি হওয়া দরকার। জীবনের শিক্ষা, ইতিহাসের শিক্ষা থেকে পাঠ নিয়ে অন্তরের বাণী শোনা দরকার। ঐতিহ্যাশ্রয়ী তপোবনে গিয়ে জীবনসাধনার পাঠ নিষ্ফল পাঠ। নতুন নতুন মানুষের ভীড়ে, উদ্ভিন্ন নতুন নতুন মূল্যবোধের অরণ্যে নিঃসঙ্গ জীবন পাঠকেন্দ্র তৈরী করা দরকার।

পবিত্র পাল

সং স্কৃ তি প্র স ঙ্গ

ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনী

নভেম্বরের ১৪ই তারিখ শনিবার কলিকাতার সদর স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে, সদর স্ট্রটের গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ পরিবেশে ফুটপাথে শিল্পী প্রকাশ কর্মকারের চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। মনোরম পরিবেশে ফুটপাথে এই চিত্র প্রদর্শনী যেমন অপূর্ব তেমনি অভুতপূর্ব। রাস্তায় যেতে যেতে স্টুডিবেকারের গতি মন্থর হয়, আরোহিনী আরোহীকে বলে দেখেছ ফুটপাথে প্রদর্শনী, লেট্ আস্ হ্যাভ্ এ লুক্। দুজনেই নেমে আসেন গাড়ী থেকে। নিউ মার্কেট ফেরৎ বিদেশিনীরা নীল চোখের উজ্জ্বল আভা নিয়ে থমকে দাঁড়ায়— হাউ ওয়ান্ডার ফুল, হাউ নাইস্। মোটরের পাশে রিক্‌শা থামিয়ে পথ চল্‌তি রিকশাওয়ালা দাঁড়ায় কোমরে হাতে দিয়ে এ'দেরি পাশে। দাঁড়ায় প্লাম্বার মিস্ত্রি, ঝাঁকা মুটে আর কনেষ্টবল। যে কনেষ্টবল রোঁদে বেড়িয়েছে ফুটপাথের বেচা-কেনা বন্ধ করতে। চোখে এদেরও বিস্ময়। প্রকাশ কর্মকারের বাঙ্খিত ছবি 'জুতা পালিশওয়ালা'র পাশে হাঁ করে এসে দাঁড়ায় বাচ্চা জুতো পালিশওয়ালা— বারে মজা এতো আমি।

রূপের সঙ্গে মিল শুধু রূপোর, সমাজ চল্‌তি এই আভিধানিক অর্থের তুষার বুঝি গলতে সুরু করলো। রূপের সঙ্গে সত্যিকার মিল তো রূপোর নয়, তা হল চোখের। হোক না সে চোখ আমার কিংবা আপনার বা সে চোখ হায়দরাবাদের নিজামেরও।

চিত্রশিল্প যেন উপরতলার তথাকথিত বিশেষ ধরণের সমঝদারের একচেটিয়া গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারছিলোনা, তাঁরাই সব বোঝেন, তাঁরাই সব জানেন, তাঁরা যা মতামত দেবেন, ভালো লাগুক আর নাই লাগুক সেটাই মেনে নিতে হবে। এই আওতার মধ্যে থাকায় চিত্রশিল্পের আসল বক্তব্য-উদ্দেশ্য-রস জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। সাধারণ মানুষের কাছে আরও পাঁচটা অনায়ত্ত বস্তুর মত চিত্রশিল্পও রয়ে গেছে রহস্যাবৃত।

ইউরোপে ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনী নতুন একটা কিছু নয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই প্রথম 'ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনী' সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। আর্ট গ্যালারী ও অভিজাত পরিবেশের মোহ কাটিয়ে ফুটপাথে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে প্রকাশ কর্মকার দুদুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এর অবশ্যম্ভাবী সুফল সুদূর প্রসারী।

প্রকাশ কর্মকারের বর্তমান প্রদর্শনীতে সর্বসমেত পনেরটি ছবি আছে। যদিও ছবি অত্যন্ত কম কিন্তু এই পনেরটি ছবিই পাঁচশটি ছবির আবেদন ধরে রাখার ক্ষমতা বা দাবী রাখে। প্রত্যেকটি ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষের মনের আশা আকাঙ্খা, হাসি আর কান্না। তুলির আঁচড়ের সহস্র সহস্র রেখা যেন ডেকে ডেকে বলছে—"শোন পথিক—শোন সাধারণ মানুষ—দেখে যাও তোমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি—অতীতকে ভুলে যাও—নিজেকে সংশোধন কর— সামনে এগিয়ে চল"। প্রকাশ কর্মকারকে শুধু শিল্পী বললে ভুল বলা হবে—বলা উচিত 'বিদ্রোহী শিল্পী'। আজ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের মধ্যে যে গ্লানি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী শিল্পী তা

ফোটাতে পেরেছেন। মনে প্রাণে যা উপলব্ধি করা যায় না তা কখনই ফোটান সম্ভব নয়, তা কবিতাই হোক সাহিত্যই হোক বা ছবিই হোক। শিল্পী দিনের পর দিন রাতের পর রাত, আমরা যাদের নীচু স্তরের মানুষ বলি তাদের সঙ্গে মিলেছেন—অনুসন্ধান করেছেন, তাদের বুঝতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এমন কয়েকজন তরুণ শিল্পীকে জানি যাদের শিল্প কলা মনে ছাপ রেখে যায় তাদেরও আজ এগিয়ে আসতে অনুরোধ করি। তা না হলে শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ফুরিয়ে যাবে। আজও বাঁকুড়ার ঘোড়া— বীরভূমের আহ্লাদী—কেন্টনগরের পুতুল—কালীঘাটের পট যে সাধারণ মানুষদের ভালবাসার মধ্যদিয়ে বেঁচে আছে— সেই সাধারণ মানুষের মন জয় করতে না পারলে শিল্প সৃষ্টির সার্থকতা বহুলাংশে ব্যর্থ হবে।

ফুটপাথে চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শিল্পী নিতাই দে'র ছবি আঁকার নূতন মাধ্যম আবিষ্কার। বর্তমান তরলতার যুগে, শিল্পী ও শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বহুল পরিমাণে কমে গেছে। আর সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে রঙ, তুলি ও অন্যান্য সরঞ্জামের দামও। শিল্পীদের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে শিল্পী নিতাই দে একটি নূতন মাধ্যম বের করেছেন—যে মাধ্যম অবলম্বন করে প্রকাশবাবু পনেরটি ছবির মধ্যে দশটি এঁকেছেন। এই মাধ্যম শিল্পকলার ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কার। এই বিশেষ মাধ্যমটি গাম্ ও ফটোগ্রাফিক রঙ্ সহযোগে তৈরী। অয়েল বা ওয়াটার কলার মাধ্যমে যা ফোটান সম্ভব এই বিশেষ পদ্ধতি মাধ্যমে তা অপেক্ষা হাজারগুণ বেশী ছবির সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব শুধু তাই নয় খরচও অনেক কম। শিল্পী মহলে এই পদ্ধতিটি চালু হলে এর আরও উন্নতি আশা করা যায়। উপরন্তু ছবির মূল্যও সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এনে দেওয়া সম্ভব।

নভেম্বরের দুটো শনি ও দুটো রবিবারে উপরোক্ত স্থানে প্রদর্শনী চলেছিল। প্রকাশ কর্মকারের এই অভিনব প্রচেষ্টা লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায় **'বোল্ড টাইপে'** আর আঁকা থাকবে জনসাধারণের মনে।

তরুণ শিল্পীরা অভিজাত পরিবেশের মোহ কাটিয়ে নেমে আসুন ফুটপাথে, পায়ে হাঁটা মানুষের মাঝে। নূতন পদ্ধতির মাধ্যমে ছবির দাম সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে আসুক। ঘরে আর কিছু থাক, থাক একটা ছবি আর দুটো ফুল। নানা দুর্বিপাকে জর্জরিত জীবনে আর কিছু না হোক অন্তত তৃপ্তি পাক এই পোড়া চোখ দুটো।

বিনায়ক সেন

স মা লো চ না

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ — ৩য় খণ্ড। বিনয় ঘোষ। মূল্য — বারো টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা।

অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ যাঁর জীবনে নেই, যিনি প্রত্যক্ষ ভগবৎ যোগাযোগের প্রমাণ হামেশা দিতে পারেন না তাঁকে গুরু বলে চালানো তো দূরের কথা মহৎ মানুষ বলে সম্মান দেওয়াও এদেশে একালে শক্ত হয়ে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্তদের ঘরের দেওয়ালে নানা গুরুর ছবি শোভা পাচ্ছে; এই সব গুরুরা নানা ধরণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারেন—তার মুখরোচক গল্প ঐ ভক্তবৃন্দের মুখে অহরহ শোনা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও যাঁরা হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করতে এসেছিলেন তাঁরাও কেউ নিজেকে অবতার সাজিয়েছেন, কেউ কীর্তন গেয়ে পথের ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর কেউ যুক্তির নামে গ্রাম্য গল্পের মালা গাঁথছেন। সে যাই হোক মহাপুরুষ যিনি, নমস্য যিনি, তিনি অসুস্থ মানুষের গায়ে হাত দিলে সে সুস্থ হবে। শোকার্তের দল তাঁর সঙ্গ পেলে অশোক আনন্দ লাভ করবে, তাঁর বিভূতি, তাঁর মহিমা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয়না এই জাতীয় ঘটনায় অহরহ প্রকাশ পেতে থাকবে। অবশ্য এ দুর্বলতা মানুষের প্রায় চিরকালের কি পূর্বে কি পশ্চিমে যীশুখৃষ্টের 'সারমন অন দি মাউন্ট' আমাদের শরীফ লেনের চ্যাটার সাহেব পড়েনি কিন্তু ভগবৎপুত্র যীশু কুষ্ঠরোগী স্পর্শমাত্রে সুস্থ করে তুলেছিলেন একথা চ্যাটার শুধু জানেনা এর ওপর তার মনের রঙ্ ফলিয়ে গল্পও শোনায় লোককে।

এহেন অবস্থায় রামমোহন বিদ্যাসাগর জাতীয় লোক কিসের জন্য শ্রদ্ধা দাবী করতে পারেন। ভক্তদের দুঃখের কথা পাঁচশো মাইল দূর থেকে জেনে ফেলতে পারতেন তো বোঝা যেত যে একটা মস্ত লোক। সে ধরণের কোন কাজ তো করেন নি, উপরন্তু একটা মন্দির দুটো মঠও যদি থাকতো তাহলেও তো বোঝা যেত যে একটা কাজ হলো, তাও নেই। তাহলে এই সব লোকেদের জন্য এত খেটে এত পয়সা খরচা করে বই ছাপানো কিসের জন্যে।

বিনয় ঘোষ মহাশয় সেই অপব্যয়ের পরিশ্রম করেছেন। যে মানুষের জীবনে ম্যাজিক নেই, ম্যাজিক দেখাবার ক্ষমতা নেই সেই মানুষের পিছনে তিনখণ্ড বই লিখেছেন, জীবনের কয়েকটা অমূল্য বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। যে বই অপব্যয় তার জন্য এই সুদীর্ঘ সমালোচনা ফেঁদে বসেছি কেন সেই কথাটা আগে চুকিয়ে নিই।

বিকৃত জীবনাদর্শের নানারকম জঞ্জালে জীবন যখন পীড়িত, যখন আধ্যাত্মিকতার ছদ্মনামে সামাজিক ব্যভিচার দোর্দণ্ড প্রতাপে চলেছে তখন খাড়া সোজা মেরুদণ্ডের দুটি লোক বাংলাদেশে এলেন— রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। এঁরা জীবনে কি কি কাজ সফল করে তুলতে পেরেছেন তার জমা খরচের ওপর এঁদের বিচার হওয়া উচিত নয়। সংস্কারবশ্যতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিচারকে জাগিয়ে তোলার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন এঁরা। যখন গতানুগতিকের ফাঁস গলায় পরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন গন্ডলিকার মত চলেছে তখন এঁরা দাঁড়ালেন মুখ ফিরিয়ে— বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার কঠিন ব্রত নিয়ে। সংস্কারের বিরুদ্ধে বুদ্ধির জাগরণকে

চিরকালই নবজাগরণ বা রেণেসাঁস বলা যেতে পারে। আমাদের চৈতন্য তো জড় নয় কিন্তু মাঝে মাঝে সংসারের স্রোতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, অন্ধবিশ্বাসের কচুরীপানা মনের স্রোত আটকে ধরে—তার উপর গুরুবাদের জগদ্দল পাথর চেপে বসে। সেখান থেকে মনকে মুক্ত করাই নবজাগরণ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কার আর মোহমিশ্র ভক্তির সঙ্গে যুক্তি আর বিচারের যে লড়াই লেগেছিল তার নেতা ছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। তাই যুক্তির পক্ষপাতী হয়ে বিনয় ঘোষের এই বই এবং আমাদের এই সমালোচনা।

বিদ্যাসাগরের দিন শেষ হতে না হতে গুরুদের মেকী আধ্যাত্মিকতার খেলা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আবার সুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মনে হয় রামমোহন বিদ্যাসাগর উভয়েই নিতান্ত একক। বাংলাদেশে এঁদের সঙ্গী জুটলোনা। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আবার জনমত গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছিল। আর আজকের বাংলার ধর্মাশ্রমগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকার, সব কিছু দেখে কেবলই মনে হয় যে রামমোহন বিদ্যাসাগর চিরকালের জন্য না হোক সাময়িকভাবে প্রতিক্রিয়ার হাতে পরাজিত হয়েছেন যে পরিণাম পৃথিবীর সব প্রতিভাবান মানুষেরই ঘটে থাকে।

বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে বাংলায় বা অন্যান্য ভাষায় খুব বেশী বই নেই যা আছে তাও সম্পূর্ণ মানুষটিকে প্রকাশ করেনা। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনা করেছেন, বিখ্যাত অভিধান রচয়িতা সুবলচন্দ্র মিত্র ইংরাজীতে লিখেছিলেন, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনাগুলি একত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সর্বশেষ যোজনা হলো বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ'। এ ছাড়া আরও কিছু বই আছে যেগুলিতে নতুন তথ্য কিছু নেই তবে বিদ্যাসাগর-চরিতের প্রচারের দিক থেকে সেগুলির অবদানও অল্প নয়।

আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে কোন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে আমরা গোটা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিনা—কারণ সুস্থ সবল জীবনাদর্শ আমাদের নিজেদেরই নেই। আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলে মনে করি তাঁদের দেবতা বানিয়ে না তোলা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। তাঁর যে ভুল ত্রুটি ঘটতে পারে, তিনিও যে রক্তে মাংসে গড়া মানুষ এ বোধ আমাদের প্রায়ই থাকেনা। ফলে জীবনচরিতে যে মানুষটা ফুটে ওঠে তার কাজ, কর্ম, কথাবার্তা সবকিছুই ঠিক এবং ঔচিত্যানুযায়ী একথা প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্রতার সীমা থাকেনা। আলোচ্য চরিত্র তখন দেবতা হয়ে ওঠেন মানুষের সঙ্গে তাঁর মিল কমে যায়।

বলাবাহুল্য এ দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ জীবনবোধ সঞ্জাত। বিনয় ঘোষ গোটা মানুষটাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চরিত্র, তাঁর মন, কর্ম, তাঁর ধ্যানধারণা এমনকি স্ববিরোধগুলি পর্যন্ত। ফল ভাল হয়েছে—তাতে লেখকের নিজস্ব চিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া গেছে যাকে স্বীকৃতি না দেওয়া অন্যায় হবে। শুধু প্রকাশিত পুথিপত্রের উপর নির্ভর না করে লেখক নতুন উপকরণের সন্ধান করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের কালের যে সব ছাত্রেরা আজও জীবিত থেকে সেই বীর নায়কের বীরত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁদেরও খুঁজে বার করেছেন।

এই অনুসন্ধিৎসা লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে আনে। যথার্থ শ্রদ্ধা আছে বলেই তিনি বিদ্যাসাগরের দুর্বলতাগুলিও দেখাতে কুণ্ঠিত হননি। একথা জোর করেই বলতে পারি যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বপ্রকাশিত জীবনচরিতগুলি থেকে আলোচ্য গ্রন্থকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এবং কোন পাঠকই এ অনুযোগ করতে পারবেন না যে এ বইয়ে নতুন কিছু নেই। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সমাজ এ গ্রন্থের আলোচনার বিষয় বস্তু হওয়ায় এ গ্রন্থের

পরিধি বিস্তৃত এবং সেইখানেই লেখক তাঁর নিজের বিশ্লেষণী শক্তিকে কাজে লাগাবার অবকাশ পেয়েছেন।

জীবনী রচনা আমাদের দেশে গুরুবন্দনার স্তর ছাড়িয়ে ওঠেনি। ফলে অধিকাংশ জীবনীই আলোচ্য চরিত্রকে তার স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত করে দেবতা করে তোলে। যে মানুষ আপন কর্মে মহৎ সেই মানুষকে জানবার এবং জানাবার চেষ্টা আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্প। বিনয় ঘোষ মানুষ বিদ্যাসাগরকে তার সামাজিক পরিবেশে উপস্থাপিত করে এই সত্যের উপর জোর দিয়েছেন যে এই চরিত্র উপকথার নয় এ মানব জীবনের সুখদুঃখের বাস্তব কাহিনী। এর মধ্যে বিচার করবার বস্তু থাকে অনুভব করার সামগ্রী থাকে। তথ্যহীন নিছক গল্প নয় আবার গল্পসর্বস্বতার দৈন্যও তার নেই।

লেখক একজায়গায় বলেছেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনে ঘটনার বৈচিত্র্য বলতে যা বোঝায় তা নেই। সে কথা ঠিক। তিনি বীরপুরুষ ছিলেন তেজস্বী ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকাশের ক্ষেত্র একটু বিভিন্ন ছিল। তাঁর পক্ষে বিরাট গ্রন্থ রচনা অসম্ভব হতোনা, পান্ডিত্য খ্যাতিকে চিরন্তন করে তুলতে দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির গভীর আলোচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন। কিন্তু সেই খ্যাতির পথ ছেড়ে তিনি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে সুরু করেন। এই কাজের মধ্যে যে ত্যাগ ও বীরত্ব আছে তা খবরের কাগজে প্রচার করার মত নয় কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাণত্যাগের বীরত্বের চেয়ে তা কম নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিতে হয়। বিরোধী পক্ষের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর শুধু লাঞ্ছনাই পেয়েছেন একথা বোধহয় সর্বাংশে সত্য নয়। যাঁরা বিরোধীপক্ষ তাঁরাও অনেকসময় তাঁর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই ঘটনার তাৎপর্য লক্ষ করবার মত। বিধবা বিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধের সমালোচনা লিখতে গিয়ে 'শ্রীগন্ডুষ জলসঞ্চারি সফর' বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন। পন্ডিতাগ্রগণ্য দেশহিতৈষী, পরহিতব্রত, নিঃস্বার্থ অব্যর্থচেষ্ট, সুলেখক, প্রবীণ, ভুবনবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের বিরুদ্ধে আমার মত অপরিচিত ব্যক্তির লেখনী ধারণ করা অসমসাহসিক ব্যাপার।

যাঁরা নানা বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধতা করেছেন তাঁরাও তাঁর চরিত্রের উদার মহত্বকে শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা করেন নি—একথা স্বীকার না করাও ইতিহাসের বিকৃতি। লেখক নানা স্থানে লোকপ্রচলিত মনগড়া ধারণা থেকে সত্যের দিকে পাঠককে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর পাথেয় কিন্তু তার দ্বারা বিগলিত না হয়ে যুক্তি ও বিচারকে ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সংস্কৃত টুলো পন্ডিতদেরও যে একটা অংশ প্রগতিশীল ছিল একথা লেখক বার বার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে গৌরীশংকরের ভূমিকা সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। লেখক বলছেন "শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ দল অন্যতম হলেও শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী পন্ডিতদেরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাধারণতঃ বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে পন্ডিতদের এই ভূমিকাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়না। তা না দেওয়ার অবশ্য কোন যুক্তি নেই, এবং ইতিহাসকেও তাতে আংশিক বিকৃত করা হয়।" শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই যে এঁদের কেউ কেউ প্রগতিশীল ছিলেন তা নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও এঁরা কেউ কেউ পা বাড়িয়েছিলেন। এই তথ্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার মধ্যে লেখক সত্যকার ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে এ গ্রন্থ সমাপ্ত হলো। বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কর্মবীরের জীবনেতিহাস আধুনিক কালের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখবার প্রথম প্রচেষ্টা সফল হলো। দয়া তাঁর আর সব গুণকে ঢেকে ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন— দয়া নয় গোটা মানুষটার চরিত্রই একটা বড় জিনিষ—লেখক বিনয় ঘোষ সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস বিবৃত করে কবির ঐ সত্যকে প্রমাণ করলেন।

এ গ্রন্থ যদি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পায় তাহলে সে পুরস্কার সংপাত্রেই যাবে। শুধু বিষয় বস্তুর মাহাত্ম্যে নয় লেখকের স্বকীয় চিন্তা ও লেখন কৌশলেও এ গ্রন্থের স্থান প্রথম শ্রেণীর জীবনী সাহিত্যের পর্যায়ে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ভাল প্রচ্ছদপট, নামকরা মুদ্রক, এবং প্রখ্যাত প্রকাশকদের সমন্বয় সত্ত্বেও বইয়ের অঙ্গ মুদ্রাকর প্রমাদে ক্রমাগতই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। চেষ্টা করলে কি এ ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া যেতনা। অবশেষে আরও একটু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বহুল প্রচার যদি সত্যি কাম্য হয় তবে মধ্যবিত্ত পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এর মূল্য মান নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ভাল হত।

সোমেন বসু

রাগ ও তাল ॥ নীহারবিন্দু চৌধুরী। প্রকাশক—সাম্প্রতিক প্রকাশনী—দাম—২৲ টাকা।

রাগ ও তাল, ২৫টি তবলা পাখোয়াজের ঠেকা এবং রাগ ও তালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রচলিত ও অপ্রচলিত রগের লহরার স্বরলিপির বই। বইটির প্রধানতঃ দুটি ভাগ। প্রথমে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্বের (থিয়োরী) একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর স্বর বৈশিষ্টকে বিভিন্ন তালের মাধ্যমে স্বরলিপির সাহায্যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সাধারণতঃ দেখা যায় যে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশের ফলে বক্তব্য কিছুটা ধোঁয়াটে হয়ে ওঠে। নীহারবাবুর বক্তব্য কোন কোন স্থলে বিচারসহ না হলেও স্পষ্ট। নূতন শিক্ষার্থীর কাছে বইখানি তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে একথা বলাই বাহুল্য। অল্প কথায় ভারতীয় সঙ্গীতের তথা রাগরাগিণীর তত্ত্বকথা পরিবেশনে নীহারবাবু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তবে বইখানির বৈশিষ্ট হল রাগাশ্রিত গৎ বা নগ্‌মাগুলিকে বাংলা আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রথায় লিপিবদ্ধ করা। এই নগ্‌মাগুলি চয়নে নীহারবাবু যথার্থ শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি আয়ত্ত করতে পারলে রাগরাগিণীর উপর সম্পূর্ণ জ্ঞান হবে না বটে কিন্তু তার বৈশিষ্টগুলি পরিষ্কার বোঝা যাবে। মাত্র ৪৪ পৃষ্ঠার বইখানির মূল্য এইখানেই।

নীহারবাবু ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা গেল যথেষ্ট খবর রাখেন এবং প্রায়ই ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রচলিত কথাগুলি ব্যবহার করে বক্তব্যগুলি পরিস্ফুট করে তুলেছেন,—বিশেষ করে তাল, ছন্দ ও লয় এই তিনটির ইংরাজী প্রতিশব্দগুলি। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে সঙ্গীতকারের মনোভাব "মুখ্যং দেহী" প্রতিযোগীতামূলক না হয়ে সহযোগীতামূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা একথা সমর্থন করি।

সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের কাছেই বইখানি রাখা উচিত।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

যেখানে রুচির মিল, সেখানেই
বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়।
এই সাইকেলের
বেলাতেই দেখুন না!
র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ
সম্বন্ধে সকলেই একমত।
কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত
এই সাইকেলটি বছরের পর
বছর ব্যবহারের পরেও সমান
নির্ভরযোগ্য থাকে।

অটুট বন্ধুত্ব

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত
বাইসাইকেল

THE RALEIGH TRADING INDIA

SEN-RALEIGH Product

SRC-59 BEN